সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

সৎ কাজে সহযোগিতা করা যেমনি জরুরী, অসৎ কাজে বাধা দেয়াও তেমনি জরুরী। সৎ ও কল্যাণের কাজে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। তাই নিজের সাধ্যমত সকলেই কমবেশি তাতে অংশগ্রহণ করে। এমনকি কেউ কেউ তো দলবেধে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে সৎ কাজের কথা বলে, কল্যাণের পথে আহবান করে। কিন্তু অসৎ ও অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার বেলায় সকলে এগিয়ে আসতে চায় না। এ ব্যাপারে দলবেধে তো দূরের কথা; ব্যক্তিগতভাবেও মানুষের ভূমিকা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য।

অথচ সৎ কাজের আহ্বান ও অসৎ কাজে বাধা দান দু'টোই যুগপৎ গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি আরেকটির পরিপূরক। আমি প্রচুর ভাল কাজ করি- এ কথা ভেবে অনেকেই হয়ত আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন। অথচ তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক অন্যায়ের ব্যাপারে তার নূন্যতম কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এ নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই, কোনো অনুশোচনা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির গুরুত্ব কম তো নয়ই, বরং আরো বেশি। কেননা কল্যাণের বিস্তৃতি না হলে অকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না; কিন্তু অকল্যাণের বিস্তৃতি ঘটলে কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত এ কারণেই হাদীসে সাধ্যমত অন্যায় প্রতিহত করাকে আবশ্যক করা হয়েছে। অন্যায় প্রতিহত করণে যার সামর্থ্য বেশি তাকে বেশি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর যার সামর্থ্য কম তাকে কম দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাউকেই এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আর এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করাকে ঈমানের দুর্বলতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতএব সৎ কাজের প্রতি আহ্বান ও অসৎ কাজে বাধা দান দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু'টোতেই সকলের সাধ্যমত ভূমিকা রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে, সৎ কাজ না করলে সাধারণত: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু অসৎ কাজ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সকলেই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সৎ কাজে আহ্বানের পাশাপাশি অসৎ কাজে বাধা দানেও আমাদের সকলকে আরো মনোযোগী হতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। ■

দাওয়াতী কাজের মর্যাদা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

অনুবাদ: 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে আর সৎ কর্ম করে এবং বলে: আমি মুসলিমদের (আত্মসমর্পণকারীদের) অন্তর্ভূক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা (মন্দ) প্রতিহত কর। ফলে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে। এর (গুণের) অধিকারী তাদেরকেই করা হয় যারা ধৈর্য ধারণ করে, আর এর অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকে যারা মহা ভাগ্যবান। [সূরা ফুস্‌সিলাত: ৩৩–৩৫]

সূরা ফুস্‌সিলাত বা হা–মীম আস সাজদাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ হওয়া সূরা সমূহের অন্যতম সূরা। সূরাটির নাম করণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্বের দারসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [পৃ.১১০-১১১]

ব্যাখ্যা:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে'। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের দ্বিতীয় অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। প্রথম অবস্থা ছিল অত্র সূরার ৩০নং আয়াত, যার অর্থ: 'যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অত:পর এর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে'। অর্থাৎ, তারাই প্রকৃত মু'মিন, হিদায়াত ও সঠিক পথপ্রাপ্ত, যারা এমন কথা বলে, যা দ্বারা নিজেদের কল্যাণ হয় এবং অন্যদেরও কল্যাণ হয়। তারা শুধু সৎ কর্মের আদেশকারী হয় না বরং তারা নিজেরাও ভাল ও কল্যাণের কাজ করে এবং মন্দ ও অকল্যাণ থেকে বিরত থাকে আবার মানুষদেরকেও মহান স্রষ্টা আল্লাহর 'ইবাদাত ও নিরংকুশ আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে। তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। এ আয়াতটি সত্য ও কল্যাণের পথের আহ্বানকারী সকলকেই শামিল করে। তবে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সূদ্দী সহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বলেছেন যে, উত্তম কথার মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্রাধিকারযোগ্য।

[ইবন কাসীর ৭/১৬৪,] সত্যের এ দাওয়াত মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি, সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে।

দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব: এ আয়াতে যেমন দা'ওয়াতী কাজের বিশেষ মর্যাদা ও ফাযীলাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে একইভাবে আলকোরআনের অন্যান্য আয়াত ও সাহীহ হাদীসেও এর যথেষ্ট মর্যাদার বর্ণনা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

'আর তোমাদের মধ্যে এরূপ এক দল থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজের নিষেধ করে আর তারাই সফলকাম'। [আল–'ইমরান: ১০৪] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর'। [আল–'ইমরান: ১১০] মহান আল্লাহ বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

'আর মু'মিন পুরুষগণ ও মু'মিন নারীগণ একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে (নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে) এদেরই ওপরে আল্লাহ দয়া করবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ অতিশয় পরাক্রমশালী, সুকৌশলী'। [আত–তাওবাহ: ৭১]

আবু সা'ঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

'তোমাদের কেহ কোন অন্যায় দেখলে সে যেন হাতের (শক্তি) দ্বারা তা পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার জিহ্বা দ্বারা তা পরিবর্তন করে, তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করে আর এটা সর্বাধিক দূর্বল ঈমান'। [সাহীহ মুসলিম ১/৬৯, হা. নং ৪৯, তাফসীরুল কুরতুবী ৪/৪৯, তাফসীর ইবন কাসীর ২/৭৮] অর্থাৎ, এ অন্যায় কর্মকে যেন অন্তরে প্রশ্রয় না দেয়া হয় এবং প্রচণ্ড ঘৃণা করা হয়। আবু সা'ঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ".

'তোমরা রাস্তার পাশে বসার বিষয়ে সাবধান হও! তারা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বৈঠকে বসা ছাড়া আর উপায় নেই, আমরা তো সেখানে কথাবার্তা বলি। তিনি

বলেন: তোমরা যদি বসতেই চাও তাহলে পথের হক আদায় করবে। তারা বললো: পথের হক কি? তিনি বলেন: দৃষ্টি সংযত করা, কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, সালামের উত্তর দান করা, সৎ কর্মের নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় কর্মকে নিষেধ করা'। [সাহীহ মুসলিম ৩/১৬৭৫, হা.নং ২১২১, আল-আদাবুল মুফরাদ ১/৩৯৩, হা. নং ১১৫০]

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'তোমরা আমার নিকট থেকে একটি বাণী হলেও তা প্রচার কর। বানু ইসরাঈলদের থেকে (তাদের মধ্যে সংঘটিত বিষয়াদির) বর্ণনা কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই আর যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে সে অবশ্যই জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেবে'। [সাহীহুল বুখারী ৪/১৭০, হা.নং ৩৪৬১]

আলকোরআন ও সাহীহ সুন্নাহর এ সব দলীল থেকে আল্লাহর সত্য দীন, বিশুদ্ধ আকীদাহ এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। একই সাথে দীন ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা, অনিবার্যতা ও ফারযিয়াতকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে, যার আওতা থেকে কোন মুসলিম নারী ও পুরুষ মুক্ত নয়।

দা'ওয়াতী কাজ না করার পরিণতি: আলকোরআন ও আস সুন্নাহর দাবী অনুযায়ী দা'ওয়াতী কাজ না করলে তার পরিণতি কি হতে পারে সে বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও সাহীহ সুন্নাতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ সব প্রমাণাদিতে হুমকী, ধমক, তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও কঠিন শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

'তাদেরকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং 'আলিমগণ পাপের কথা হতে এবং হারাম ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করছে না কেন? বাস্তবিকই তারা যা করছে তা খুবই নিন্দনীয়'। [আল-মায়িদাহ: ৬৩] ইবন জারীর আততাবারী এবং হাফিয ইবন কাসীর ইবন 'আব্বাস (রা) এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন: দা'ওয়াতী কাজ না করার বিষয়ে এ আয়াতটি আলকোরআনের সবচেয়ে কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণকারী আয়াত। [তাফসীরুত্ তাবারী ৪/৬৩৮, ইবন কাসীর ৩/১৩২] আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরো বলেন:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

'বানু ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের ওপর দাউদ ও ঈসা ইবন মারইয়ামের মুখে লা'নত করা হয়েছিল; এ লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল তারা আদেশের বিরোধিতা করেছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তারা যে মন্দ ও গর্হিত কর্ম করতো তা' থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করতো না; বাস্তবিকই তাদের কর্ম অত্যন্ত গর্হিত ছিল'। [আল- মায়িদাহ: ৭৮-৭৯]

প্রসিদ্ধ সাহাবী নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا

خَرَقْنَا فِي نَ ِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا.

'আল্লাহর সীমা–রেখা (বিধি–বিধান) এর উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং এর মধ্যে পতিত ব্যক্তি; অর্থাৎ, সীমা লঙ্ঘনকারীর উপমা হলো এক দল লোকের মতো, যারা কোন জাহাজের স্থান নির্বাচনে লটারী করেছিল, তাদের কারো ভাগে জাহাজের উপর তলায় কারো ভাগে নীচ তলায় আসন মেলে। অত:পর নীচ তলার লোকদের যখন পানি পানের প্রয়োজন হয়, তখন তারা উপরের লোকদের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে। তারপর তারা বলাবলি করে যে, আমাদের অংশে আমরা যদি ফুটো করে নেই তাহলে উপরের লোকদেরকে আর কষ্ট দিতে হয় না। তারা (উপরের লোকেরা) যদি তাদেরকে তা (জাহাজ ফুটো) করার সুযোগ দেয়, তাহলে সকলে মারা পড়বে আর যদি তাদের হাত ধরে এ কর্ম থেকে তাদেরকে বিরত রাখে তাহলে তারাও মুক্তি পাবে এবং বাকী সকলেই মুক্তি পাবে'। [সাহীহুল বুখারী, ৩/১৩৯, হা.নং ২৪৯৩]

যায়নাব বিনত জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الـ ـصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সৎ কর্মশীল ব্যক্তিগণ থাকা সত্বেও কি আমরা ধ্বংস হবো? তিনি বলেন: হ্যাঁ, যখন মন্দ ও খারাপ কাজ অধিক পরিমাণ বেড়ে যাবে'। [সাহীহুল বুখারী ৪/১৩৮, হা.নং ৩৩৪৬, সাহীহ মুসলিম ৪/২২০৭, হা. নং ২৮৮০]

হুযাইফাতুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় খুব শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের ওপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন। তখন তোমরা তাঁকে ডাকবে, তিনি তখন আর তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন না'। [আত–তিরমিযী ৪/৪৬৮, হা.নং ২১৬৯, তিরমিযী ও আলবানী (রহ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, তাফসীরুল বাগাভী ২/৮৫, ইবন কাসীর ২/৭৮]

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْ ُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَ ْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ.

'বানু ইসরাঈলদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে ত্রুটির অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলো, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে বলতো: হে অমুক ব্যক্তি! আল্লাহকে ভয় কর এবং তুমি যা করছো তা পরিত্যাগ কর; কেননা এটা তোমার জন্য বৈধ নয়। পরের দিন তার সঙ্গে আবারো দেখা হয়, সে ব্যক্তি তার পূর্বাবস্থার উপরই অটল থাকে। এ অবস্থাও তাকে তার খাবারের সঙ্গী, পান করার সঙ্গী এবং বসার সঙ্গী হতে বারণ করে না। তারা যখন এ আচরণ করে তখন আল্লাহ তাদের পরস্পর দ্বারা পরস্পরের অন্তরে আঘাত করেন'..। [আবু দাউদ ৪/১২১, হা.

নং ৪৩৩৬, তাফসীরুল কুরতুবী ৬২৫৩, কাসীর ৩/১৪৫, আদওয়াউল বায়ান ১/৪৬১, ইমাম আত তিরমিযী ভিন্ন শব্দে এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন: হাদীসটি হাসান গারীব, আততিরমিযী ৫/২৫২, হা.নং ৩০৪৭। 'আল্লামা আলবানী আবুদ দাউদ ও তিরমিযীর হাদীসকে যা'য়ীফ বললেও হাদীসটির অর্থ সাহীহ, অন্যান্য দলীল প্রমাণগুলোও এ হাদীসকে সমর্থন করে]

আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

وَالَّذِي نَفْسُ ُمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، حَتَّى لَا يُقَالُ: اللَّهُ اللَّهُ. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، فَلَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ! একটি একটি করে ইসলামের স্তম্ভ ভেঙ্গে যাবে, এক পর্যায়ে আল্লাহ! আল্লাহ! বলাও হবে না। তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর দুষ্ট লোকদের শাসন চাপিয়ে দেবেন, তারা তখন তোমাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালাবে, অত:পর তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষগুলো দু'আ করবে, তাদের দু'আ কবুল হবে না'। [ইবন আবীদ্ দুনইয়া পৃ. ৩৮, হা. নং ৩৪]

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْ ِرُونِي، فَلَا أَنْ ُرُكُمْ.

'হে মানব সকল! আল্লাহ 'আয্যা ও জাল্লা বলেন: তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর আর অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ, এমন মূহুর্ত আসার আগে যখন তোমরা আমাকে ডাকবে আমি তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেব না, আমার নিকট চাইবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না এবং তোমরা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না'। [মুসনাদ আহমাদ ৪২/১৪৯, হা.নং ২৫২৫৫, সাহীহ ইবন হিব্বান ১/৫২৬, হা.নং ২৯০, আল বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা, ১০/১৬০, হা. নং ২০২০০, আলবানী হাদীসটি যা'য়ীফ বলেছেন]

আযান ও মুয়াযযিনের ফযীলত, কারো কারো মতে এ আয়াতে সত্যের দিকে আহ্বানকারী বলতে মুয়াযযিনগণকে বুঝানো হয়েছে। সে তো সর্বোত্তম কাজ; সালাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। এ কারণেই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), ইবন 'উমার ও 'ইকরামা প্রমূখ বলেছেন: এ আয়াতটি মুয়াযযিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর ৭/১৬৫, মা'আরিফুল কোরআন, পৃ. ১২০৫]

এ অর্থে আয়াতে কারীমাতে মুয়াযযিনদের বিশাল মর্যাদার কথা বলা হয়েছে; যেহেতু তারা সালাতের দিকে এবং কল্যাণের দিকে মানুষদেরকে ডাকে এবং আযান দেয়।

মুয়াযযিন, আযান ও আযানের জওয়াব দেয়ার অনেক ফাযীলত ও মর্যাদার কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী মু'য়াবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, **الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** 'কিয়ামাত দিবসে সকল মানুষের মধ্যে মুয়াযযিনগণের দীর্ঘ গলা হবে'। [সাহীহ মুসলিম, ১/২৯০, হা.নং ১৪, ইবন মাজাহ ১/২৪০, হা.নং ৭২৫, মুসনাদু ইমাম আহমাদ

আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন] অর্থাৎ পরকালে সকল মানুষের চেয়ে তাদের মর্যাদা অধিক হবে। তাদের এ মর্যাদা সম্পর্কে সকল মানুষ জানবে এবং লম্বা দেহ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে সকলেই তাদেরকে চিনতে পারবে ও দেখতে পারবে।

প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

‘ইমাম হলো যামিন, আর মুয়াযযিন হলো বিশ্বস্ত। আল্লাহ ইমামগণকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর মুয়াযযিনগণকে ক্ষমা করেছেন’। [মুসনাদ আহমাদ ১৩/২২২, হা.নং ৭৮১৮, সুনান আবী দাউদ ১/১৪৩, হা.নং ৫১৭, আত তিরমিযী ১/৪০২, হা.নং ২০৭, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন:

لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا لَكَمُلَ أَمْرِي وَمَا بَالَيْتُ أَنْ لاَ أَنْتَ ِبَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَلَا لِ ِيَامِ النَّهَارِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ" ثَلَاثًا.

‘আমি যদি মুয়ায্যিন হতাম তাহলে আমার সব বিষয় পরিপূর্ণ হতো, রাতে কিয়ামুল লাইলের জন্য উঠলাম না এবং দিনের বেলায় সিয়াম পালন করলাম না, এর তোয়াক্কা করতাম না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: ‘হে আল্লাহ! তুমি মুয়াযযিনদেরকে ক্ষমা কর’। কথাটি তিনি ৩ বার বলেছেন’। [ইবন কাসীর ৭/১৬৪]

‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা) বলেন:

لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا مَا بَالَيْتُ أَنْ لاَ أَحُجَّ وَلَا أَعْتَمِرَ وَلَا أُجَاهِدَ.

‘আমি যদি মুয়ায্যিন হতাম তাহলে আমি হজ্জ করলাম না, উমরাহ করলাম না এবং জিহাদ করলাম না, তার পরওয়া করতাম না। [মুসান্নাফু ইবন আবী শাইবা ১/২০৪, ইবন কাসীর ৭/১৬৪]

উল্লেখ্য যে, আযানের জওয়াব দেয়া এবং আযান শেষে নির্দিষ্ট কতিপয় দু‘আ পাঠ করার কথা সাহীহ হাদীসে রয়েছে। আযানের উত্তর দেবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করা। সর্বোত্তম সালাত ও সালাম হলো দরুদে ইবরাহীম। ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

‘তোমরা যখন মুয়াযযিনের আযান শুনবে তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বলো। অতঃপর আমার প্রতি সালাত পাঠ করো; কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার সালাত পাঠ করে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহ ‘আয্যা ও জাল্লার নিকট উসীলার প্রার্থনা করো; কেননা উসীলা হলো জান্নাতের একটি মর্যাদার নাম, আল্লাহ তা‘আলার অসংখ্য বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনেই এ মর্যাদা

লাভ করবে। আমি আশা করি আমি হবো সেই মর্যাদাবান ব্যক্তি। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্যে উসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্যে আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে পড়বে'। [সাহীহ মুসলিম ১/২৮৮, হা.নং ৩৮৪]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে উসীলার দু'আ পাঠ করা। সাহাবী জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আটি বলে, (যার অর্থ): হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব! তুমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মর্যাদা ও সম্মান দান করো এবং তাঁকে প্রশংসিত মাকামে অধিষ্ঠিত করো, যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছো, কিয়ামাত দিবসে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হবে'। [সাহীহুল বুখারী ১/১২৬, হা. নং ৬১৪, ইবন কাসীর ৩/৯৪]

وَعَمِلَ صَالِحًا **'আর সে সৎ কর্ম করে'** এর দ্বারা সকল ধরনের সৎকার্য ও ভাল কর্ম তৎপরতাকেই বুঝানো হয়েছে। নেক 'আমল বা সৎ কর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সৎ কর্ম ছাড়া পরিত্রাণ লাভের আশা করা যায় না। মহান আল্লাহ তা'আলা মু'মিন, মুসলিম নারী পুরুষের জন্যে যে বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন সে সব স্থানে খাঁটি ঈমান সহ 'আমলে সালিহ বা সৎ কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

'আর পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকার্য করে এবং সে মু'মিনও হয়, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং খেজুর কণা (সামান্য) পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না'। [আন নিসা: ১২৪] মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

'মু'মিন পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎ কর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুন্দর জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উত্তম পুরস্কার দান করবো'। [আন নাহল: ৯৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ.

'যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহমান; আর এটাই বিশাল সফলতা'। [আল বুরুজ: ১১] তাই নেক 'আমল ও সৎ কর্ম করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন: যখন আল্লাহর বাণী: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 'আর আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন' [আশ্‌শু'আরা: ২১৪] নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي

عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

'হে কুরাইশ সমাজ! তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জীবন ক্রয় করে নাও, আমি আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের কোন উপকারে আসবো না। হে 'আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর! আমি আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের কোন উপকারে আসবো না। হে 'আব্বাস ইবন 'আব্দিল মোত্তালিব! আমি আল্লাহর সম্মুখে তোমার কোন উপকারে আসবো না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু, সাফিয়্যাহ! আমি আল্লাহর সম্মুখে তোমার কোন উপকারে আসবো না। হে রাসূলুল্লাহর মেয়ে, ফাতিমা! আমার নিকট তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যা খুশি চাও। আমি আল্লাহর সম্মুখে তোমার কোন উপকারে আসবো না'। [মুসলিম ১/১৯২, হা. নং ৩৫১]

وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ **'এবং বলে: আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত'**। আল্লাহ তা'আলার দীনের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং সে পথে মানুষদেরকে ডাকা এ দুটি উচ্চ পর্যায়ের গুণাগুণ ও উপাদান উল্লেখের পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও উপাদানের সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে যে, ঘোষণা করো: 'আমি মুসলিম'। এ আয়াতে ঘোষিত উপর্যুক্ত ৩টি স্তর হলো মুসলিম ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ স্তর, এর চেয়ে উচ্চ স্তর আর নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিস্থিতিতে এই ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা ছিল এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা জংগলে পা দিয়েছে, যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। এর সাথে যে ব্যক্তি আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ খুলেছে, সে যেন তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র পশুকুলকে আহ্বান জানিয়েছে। তবে আমি মুসলিম বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার পতাকাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায়। এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র ও উর্ধ্বে রাখা হচ্ছে পূর্ণমাত্রা নেকী এবং দায়িত্বও বটে। [তাফহীমুল কুরআন ১৪/২৭] উল্লেখ্য যে, আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আর বলে: আমি নিশ্চয়ই মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত', এখানে আল্লাহ তা'আলা এ শর্ত করেননি যে, 'ইনশা আল্লাহ' বলতে হবে। তাই যারা মনে করে যে, 'আমি মুসলিম, ইনশা আল্লাহ' এমনটি করে বলতে হবে এ আয়াত তাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করছে। [তাফসীরুল কুরতুবী ১৫/৩৬০]

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ **'ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না'**, এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার পথে দা'ওয়াতকারীদেরকে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। [ইবন কাসীর ৭/১৬৫]

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ **'উৎকৃষ্ট দ্বারা (মন্দ) প্রতিহত কর, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে**। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর', অর্থাৎ, দা'ওয়াতী কাজে সংশি-ষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের গুণ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। সর্বোত্তম কাজ হলো, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তোমরা তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ

প্রকাশ করে, তার মোকাবেলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। যারা এটা করবে আল্লাহ তাদেরকে শাইতানের হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং শত্রু তার অনুগত হবে এবং বন্ধুতে পরিণত হবে। [তাফসীরুত তাবারী ১১/১১২, ইবন কাসীর ৭/১৬৬]

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا **'এর (গুণের) অধিকারী তাদেরকেই করা হয় যারা ধৈর্য ধারণ করে**, অর্থাৎ এবিষয়টি অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হলেও তা বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। এর জন্য সাহসী লোকের প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। এ সব গুণাবলী যার মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামী তাকে তার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারে না।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ **আর এর অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকে যারা মহা ভাগ্যবান**। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মাকসূদে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই এই স্তরের মানুষেরা মহা সৌভাগ্যবান বলে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

শিক্ষা ঃ

এ আয়াতগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় শিক্ষার কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. আল্লাহ তা'আলার পথের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির কথা সর্বোত্তম কথা, আর তিনিও সর্বোত্তম ব্যক্তি।
২. সালাতের দিকে আহ্বানকারী মুআযযিনের সুউচ্চ মর্যাদা।
৩. সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নিজের ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করা এবং সত্যের উপর অবিচল থাকা ও ঘোষণা দেয়া যে, আমি মুসলিম।
৪. ভাল–মন্দ, সত্য–মিথ্যা, হক ও বাতিল কখনো সমান হতে পারে না।
৫. হকপন্থীদের বিরুদ্ধে শত্রুদের অপপ্রচার ও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার অপরিহার্য।
৬. সত্যপন্থী ও সত্য প্রকাশ, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিতদের আচার আচরণ ও ব্যবহার উত্তম হওয়া।
৭. শত্রুদের সাথে ভাল ব্যবহার ও ভাল আচরণ অভ্যাসে পরিণত করা।
৮. ধৈর্য, সহনশীলতা, সাহস, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করা।
৯. আল্লাহর তা'আলার নিকট পুরস্কার লাভের জন্য উন্নত গুণাবলী ও সুউচ্চ চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

দারসুল হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَ ْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ، يُرِيدُ بِهَا صِلَةً، إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً، إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً

'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবু বাকর (রা)কে গালি দিল। এ সময় নাবী (সা) বসা ছিলেন এবং নাবী (সা.) আশ্চর্যান্বিত হয়ে মৃদু হাসছিলেন। লোকটি যখন আরও বেশি গালি দিতে লাগল তখন আবু বাকর (রা) তার কোনো কোনো কথার প্রতিবাদ করলেন। এতে নাবী (সা) রাগান্বিত হয়ে উঠে গেলেন। সেসময় আবু বাকর (রা.)ও তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে গালি দিতেছিল তখন তো আপনি বসা ছিলেন। আর যখন আমি তার কোনো কোনো কথার প্রত্যুত্তর করলাম তখন আপনি রাগ করে উঠে আসলেন? তিনি বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি তোমার পক্ষ থেকে জওয়াব দিতেছিলেন। আর যখন তুমি তার কিছু কথার উত্তর দিতে লাগলে তখন শয়তান ঢুকে গেল। আর আমি তো শয়তানের সাথে বসে থাকতে পারি না। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু বাকর! তিনটি বিষয় এমন যার প্রত্যেকটি সত্য। যে বান্দার উপর কোনো প্রকার যুল্‌ম করা হয়, আর সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার কোনই প্রতিবাদ করে না, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তার সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার ধন-সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দেন। যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং এর দ্বারা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তা আরও কমিয়ে দেন।[১]

ব্যাখ্যা : হাদীছটিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা রয়েছে। সেগুলো হলো,

কেউ গালি দিলে প্রতি উত্তর না করা : সাধারণত: কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি রাগান্বিত হয়ে কটু কথা বা গালাগালি করলে প্রতিপক্ষও তার অনুরূপ প্রতিউত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে তর্ক-বিতর্ক থেকে মারামারি হয়ে অনেক দুঃখজনক ঘটনার জন্ম দেয় এবং উভয় পক্ষেরই প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এ হাদীছে বলা হয়েছে, উভয়ই যদি বাদ প্রতিবাদে লিপ্ত হয়,

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং-৯৬২৪।

তাহলে তাদের মধ্যে শয়তান অবস্থান নিয়ে উভয়কে উত্তেজিত করতে থাকে। অপরদিকে কটু কথা ও গালাগালি করা স্বত্তেও যদি উক্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে এ ধরনের ক্ষতি থেকে উভয়-ই রক্ষা পায়। এ ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেন বলে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ – وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْ ِرُونَ

"তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করে চলো। আর শয়তানের কুপ্ররোচনা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা। নিশ্চয় যারা মুত্তাকী তাদের নিকট শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা পৌঁছলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তখন তারা সত্যদ্রষ্টা হয়ে যায়।"[২]

যুলুমের শিকার হলে ধৈর্য ধারণ করা : যে ব্যক্তির প্রতি কেউ যুলুম করে উক্ত মাযলুম ব্যক্তি যদি আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধৈর্য ধরে এবং প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে স্বীয় মদদ দ্বারা সাহায্য ও শক্তিশালী করেন। আল্লাহ মাযলুমের দু'আ কবুল করেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সা.) মু'আয (রা.) কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন, মযলুমের দু'আ থেকে সাবধান থেকো, কেননা সেটি ও আল্লাহর মাঝে কোনো ব্যবধান থাকে না।[৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুমের শিকার হয়েও ধৈর্য ধরে এবং প্রতিশোধস্পৃহা না হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করে আল্লাহ তার সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি করে দেন, ফলে কালক্রমে যালিম মাযলুমের কাছে অবনত হতে বাধ্য হয়।

বেশী বেশী দান করা : আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা বা মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বৃদ্ধির জন্য যে ব্যক্তি দান করে, আল্লাহ তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তা'আলা এর উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাদের উপমা হলো একটি শস্যদানা, যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রতিটি শীষে একশতটি দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ হলেন সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।"[৪]

ভিক্ষা বা সওয়াল করা থেকে বিরত থাকা : জীবন ধারণের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করা বা কারো কাছে সওয়াল করা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। একান্ত প্রয়োজন

---

২. ৭, সূরা আল্ আ'রাফ : ১৯৯-২০১।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, বাবু ইত্তিকায়ি ওয়াল হায্রি মিন দা'ওয়াতিল মাযলুম, হাদীছ নং ২৪৪৮।
৪. ২, সূরা আল্ বাকারা : ২৬১

ব্যতীত এ গর্হিত কাজটিকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَبِيـ ـَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الـ ـَدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيـ ـَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُـ ـِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُـ ـِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُـ ـِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيـ ـَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا "

'কাবীসা ইবন মোখারিক আল্ হিলালী (রা) বলেন, একবার আমি কিছু দেনার জামিন হয়েছিলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলাম, সে ব্যাপারে তাঁর নিকট কিছু চাওয়ার জন্য। তখন তিনি বললেন, অবস্থান কর যাবৎ না আমার নিকট যাকাতের মাল আসে, যা থেকে আমি তোমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ রদব। অতঃপর তিনি বললেন, হে কাবীসা, তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারও জন্য সওয়াল করা হালাল নয়। যে ব্যক্তি কোনো দেনার জামিন হয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল যতক্ষণ না সে তা পরিশোধ করে। অতঃপর সে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখবে। যে ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ এসে তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল যতক্ষণ না সে তার আবশ্যক পূর্ণ করার মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে এবং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়েছে এমন কি তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল যতক্ষণ না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে। হে কাবীসা! এগুলো ব্যতীত সওয়াল করা হারাম। সওয়ালকারী তা দ্বারা হারাম খায়।'[৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»

'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য মানুষের নিকট তাদের সম্পদ যাচনা করে সে নিশ্চয় (দোযখের) অঙ্গার যাচনা করে। সুতরাং সে চাইলে তা কম করুক অথবা বেশী করুক।'[৬]

عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا»

'সামুরা (রা) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সওয়াল হল ক্ষতস্বরূপ যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি তার মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার মুখমণ্ডলে তা থাকতে দিক আর যার ইচ্ছা সে তা পরিত্যাগ করুক। তবে কোনো ব্যক্তি যদি শাসকের নিকট সওয়াল করে অথবা এমন বিষয়ে সওয়াল করে যা ব্যতীত কোনো উপায় নেই তাহলে ভিন্ন কথা।'[৭]

---

৫. মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মান তাহিল্লু লাহুল মাসয়ালাতি লিন নাসি, হাদীছ নং ১০৪৪।
৬. মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু কারাহিয়্যাতিল মাসয়ালাহ, হাদীছ নং ১০৪১।
৭. আবু দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মা তাজুযু ফৌহিল মাস্য়ালাহ, হাদীছ নং ১৬৩৯।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মানুষের নিকট সওয়াল করে অথচ তার প্রয়োজন পূরণের মত সম্পদ আছে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার সওয়াল তার মুখমণ্ডলে ক্ষতস্বরূপ হবে। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ কি? তিনি বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা সে পরিমাণ স্বর্ণ।[৮]

حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِ ْنٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ، فَأَخَذَ كِتَابَهُ، فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ، وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: يَا ُمَّدُ، أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ، كَ َحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» – وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ – فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ – وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ – قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»،

'সাহল ইবন হানজালিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াল করে অথচ তার প্রয়োজন পূরণের মত সম্বল আছে, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন বৃদ্ধি করে। একজন বর্ণনাকারী নুফাইল অন্যত্র বলেছেন, (বলা হলো) কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোনো ব্যক্তির জন্য সওয়াল করা উচিত নয়? তিনি বললেন, সকাল বিকাল খাবার পরিমাণ সম্পদ থাকলে। অপর জায়গায় নুফাইলী বলেছেন, তিনি বলেছেন, যার নিকট এক দিনের অথবা এক রাত ও এক দিনের খাদ্য থাকে।'[৯]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ»، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ، أَوْ عِدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا»،

'আতা ইবন ইয়াছার (রহ) বনি আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, একবার আমি ও আমার পরিবার বাকী'উল গারকাদে আসলাম। তখন আমার পরিবার বলল, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গিয়ে কিছু চাও, যা আমরা খেতে পারব। তারা তাদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতে লাগল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গিয়ে এক

---

৮. তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, বাবু মান তাহিল্লু লাহুয্ যাকাত, হাদীছ নং ৬৫০।
৯. আবু দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মান ইউ'তা মিনাস সাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, হাদীছ নং ১৬২৯।

ব্যক্তিকে পেলাম যে তাঁর নিকট কিছু চাইছে আর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছেন, তোমাকে দেওয়ার মত কিছু পাচ্ছিনা। তখন সে লোকটি রাগান্বিত হয়ে একথা বলতে বলতে ফিরে গেল যে, আমার জীবনের শপথ! আপনি যাকে চান তাকেই দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তাকে দেওয়ার মত কিছু না পাওয়ায় সে রাগ করছে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারও নিকট কিছু সওয়াল করে অথচ তার নিকট এক উকিয়া (৪০ দিরহাম) অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ আছে, নিশ্চয় সে জোর করে সওয়াল করে।[১০]

عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ»

'হোব্‌শী ইবন জুনাদা আস্ সালুলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বিদায় হজ্জে 'আরাফাতে দাড়িয়ে বলতে শুনেছি, যখন তাঁর নিকট এক বেদুঈন এসে তাঁর চাঁদরের কোনা ধরে কিছু চাইল এবং তিনি তাকে দান করলেন। এ সময়ে সওয়াল নিষিদ্ধ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, নিঃস্ব অভাবী এবং অপমানকর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যতীত কারও জন্য সওয়াল করা বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য মানুষের নিকট সওয়াল করবে কিয়ামাতের দিন সওয়াল তার মুখমণ্ডলে ক্ষতস্বরূপ হবে এবং দোযখের উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডরূপ হবে যা সে খেতে থাকবে। সুতরাং যে চায় তা কমিয়ে ফেলুক আর যে চায় তা বৃদ্ধি করুক।'[১১]

عَنْ ثَوْبَانَ – قَالَ: وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟»، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا "

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুক্ত দাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কে আমার জন্য এ জিম্মাদারী গ্রহণ করবে যে, সে মানুষের নিকট কিছু চাইবে না আর আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করবো? তখন ছাওবান (রা.) বললেন, আমি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কারও নিকট কিছু চাইতেন না।[১২]

এ হাদীছগুলোতে কোন্ কোন্ অবস্থায় সওয়াল করা যাবে তার বর্ণনা রয়েছে। এসকল প্রয়োজন ব্যতীত যারা সওয়াল করবে তাদেরকে আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ইসলাম ভিক্ষা বা সওয়াল করাকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ ভিক্ষা করা বা সওয়াল করা অত্যন্ত অপমানজনক ও ঘৃণিত কাজ। অপরদিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিশ্রম করাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। মূলত: ইসলাম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষকে সাবলম্বী করতে চায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْ َارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: «ائْتِنِي

---

১০. প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ১৬২৭।

১১. তিরমিযী, আবওয়াবুয্ যাকাত, বাবু মা জাআ মান লা-তাহিল্লু লাহুস সাদাকাহ, হাদীছ নং ৬৫৩। হাদীছটি দুর্বল। তবে অন্যান্য সহীহ হাদীছ দ্বারা সমর্থিত।

১২. আবু দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু কারাহিয়াতিল মাসয়ালাহ্, হাদীছ নং ১৬৪৩।

بِهِمَا»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا»، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْ َارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ»، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَ ْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ .

'আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের এক ব্যক্তি নবী সা. এর নিকট এসে তাঁর কাছে কিছু চাইল। তিনি বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? সে বললো, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। আর আছে একটি পাত্র, যাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা হাতে নিয়ে বললেন, এগুলো কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহামে নিতে পারি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন, এর অধিক মূল্য কে দিতে পারে? আর একজন বললো, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি সে দু'টো তাকে দিলেন এবং দিরহাম দু'টি নিয়ে তা আনসারী ব্যক্তিকে দিলেন এবং বললেন, এক দিরহাম দ্বারা খাবার খরিদ করে পরিবার-পরিজনকে দাও, আর অপরটি দ্বারা একখানা কুঠার খরিদ করে আমার নিকট নিয়ে এসো। সে তা তাঁর নিকট নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সা. স্বহস্তে তাতে একটি কাঠ (হাতল) লাগিয়ে দিলেন, তারপর তাকে বললেন, যাও, লাকড়ি কাটো এবং বিক্রি করো। পনেরো দিন যেন আমি তোমাকে না দেখি। লোকটি চলে গেলো এবং লাকড়ি কেটে বিক্রি করতে লাগলো। পরে (একদিন) সে আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম ছিলো। সে এর থেকে কিছু দ্বারা কাপড় আর কিছু দ্বারা খাবার খরিদ করলো। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম, সে সওয়ালের চেয়ে যদ্দরুন কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে একটি বিশ্রী কালো দাগ পড়বে। সওয়াল করা তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য সংগত নয়। নিঃস্ব গরীবের জন্য; অবমাননাকর ঋণী ব্যক্তির জন্য; যার উপর রক্তপণ আছে যা সে পরিশোধ করতে অপারগ।'[১৩]

যাকাত ও দান সাদাকা দ্বারা ইসলামের উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র নিরসন করা ও উপার্জনে অক্ষম অসহায় ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে কর্মক্ষম ব্যক্তিদেরকে যাকাত বা দানের মাধ্যমে পুজি সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপরে উল্লেখিত হাদীছ থেকে সেটিই বুঝা যায়। সুতরাং যাকাত ও দান সাদাকার ক্ষেত্রে দাতাকে কর্মসংস্থানের দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

ড. আবু তাবাসসুম

১৩. আবু দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মা তাজুযু ফীহিল মাস্য়ালাহ্, হাদীছ নং ১৬৪১।

চিন্তাধারা

সাদাকাহ ঃ একটি সর্বোত্তম মানবিক কাজ

ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন

দান বা 'সাদাকাহ' শব্দটি আরবি মূল শব্দ 'সিদক' থেকে এসেছে। ইসলামী পরিভাষায় সাদাকাকে "বিনিময়ে কোন কিছু না চেয়ে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে কাউকে কিছু দেওয়াকে" বোঝানো হয়েছে।

শরীয়তে দান দুই ভাগে বিভক্ত। একটি এমন দান যা বিশেষ কিছু শর্তে মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ কিছু সম্পদে ফরয হয়। এমন দানকে বলা হয় যাকাত। আর অন্য দানটি এমন যে, মুসলিম ব্যক্তিকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তার উপর অপরিহার্য করা হয়নি। এমন দানকে বলা হয় সাদাকা।

আল্লাহ ধনীদের ওপর সম্পদের যাকাত এবং ওশর ফরজ করেছেন। সে সঙ্গে সাদাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইসলামে জাকাত ও ওশরের পরিমাণ নির্ধারিত কিন্তু সাদাকার ব্যাপারে কোনো সীমা বাঁধা নেই। উদ্দেশ্য, দানের ক্ষেত্রটাকে প্রসারিত করে এর মাধ্যমে সব অভাবীরাই যেন সুবিধা পায় আর দাতা অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়।

সব ভাল কাজের পুরস্কার সমান নয়, হবার কথাও নয়। পবিত্র কুরআনই এ ব্যাপারটি পরিস্কার করে দিচ্ছে কোন কাজের পুরস্কার কতটুকু।

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"যে সৎকাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য প্রতিদান হবে দশ গুণ। আর যে অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তার প্রতিদান হবে শুধু অনুরূপ এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না" (সুরা আল আনআম-১৬০)।

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ চাইলে তার জন্য আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (বাকারাহ- ২৬১)।

আবার সূরা হুদের ২০ নম্বর আয়াতে যারা নিজেরাও খারাপ পথে চলে এবং অন্যদের খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে তাদের দ্বিগুণ শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে সাধারণ সৎ কাজে আল্লাহর বিধানে প্রতিদান দশগুন পরিমান বৃদ্ধির কথা বলা হলেও দান-সাদাকায় সাত শত গুন এমনকি আরো অনেক বেশী প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। রোজায় প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, রোজা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ যত বেশী নিজ হাতে এর প্রতিদান দেবেন। আবার আল্লাহর পথে জীবন দান

করলে তো ঋণ ছাড়া সব মাফ। এর কারণ যে কোন ভাল বা খারাপ কাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার-তিরস্কারের স্থায়ী নিয়ম কাজের ধরণ, কাজে উৎসর্গতা এবং চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। দান করতে মালের অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বিধায় সাধারণ ভাল কাজের চেয়ে দানের পুরস্কার অনেক গুণ বেশী। আবার জীবন মানুষের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান বিধায় কেউ শহীদ হলে ঋণ ছাড়া অন্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে কাজে যত বেশী ত্যাগ স্বীকার সে কাজে তত পুরস্কার, কাজের ফলাফল বা পরিমান যাই হোক না কেন।

দানের পূর্ব শর্ত হল মানুষের প্রতি সহনশীল হওয়া।

"মানুষের সাথে সহনশীল হওয়া ঈমানের অর্ধেক। আর তাদের সাথে স্নিগ্ধতা এবং উদারতা হলো জীবনের অর্ধেক"-আল-হাদিস।

"আল্লাহর শত্রুদের সাথে সহনশীলতা হল এমন এক সর্বোত্তম দান বা সদকা যা মানুষ নিজের এবং তার ভাইদের পক্ষ থেকে দিয়ে থাকে" (ইমাম জাফর সাদিক (রহ)।

চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) এর একটি বক্তব্যে দুনিয়া-আখেরাতের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

দুনিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আখেরাত এগিয়ে আসছে। আর এ দুটির প্রত্যেকটিরই আছে সন্তানাদি। তোমরা আখেরাতের সন্তান হও। কারণ আজ শুধু আমল, হিসাব নেই। আর আগামীকাল শুধু হিসাব, আমল নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৩৫৬৩৬)

আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত হল, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমলের ধারা বন্ধ হয়ে গেলেও জীবদ্দশায় নির্দিষ্ট কিছু আমল করে গেলে মৃত্যুর পরও সওয়াব জারি থাকে।

দানের ব্যাপারে এত তাগিদ কেন?

প্রথমত, দাতা-গ্রহীতার অনিবার্য নিয়মটি একটি প্রকৃতিগত বিষয়ও বটে। দান এমন একটি কাজ যা ছাড়া মানুষ তো দূরের কথা প্রকৃতিও তার জায়গায় এক দন্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আমাদের শরীর কোষে প্রতিনিয়তই যে মেটাবলিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলছে, তার মাধ্যমে অনিবার্যভাবে তৈরি হয় ক্ষতিকর কিছু ফ্রি র‍্যাডিকাল স্পেসিস। ফ্রি র‍্যাডিকাল স্পেসিসকে নিউট্রাল করার জন্য শরীরেই তৈরি হয় এন্টি-অক্সিডেন্ট। এই এন্টি-অক্সিড্যান্টগুলো ফ্রি র‍্যাডিকাল স্পেসিসকে ইলেকট্রন দান করে নিউট্রাল না করলে শরীরের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনতো। কিন্তু ন্যাচারাল প্রক্রিয়ার এই দানে এন্টি-অক্সিডেন্ট নিজেরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অথচ শরীর বিরাট বিপর্যয় থেকে বেঁচে যায়।

সূর্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে পৃথিবীবাসীকে প্রতিনিয়ত আলো ও তাপ দান করে সজীব রাখছে। আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির ফোটা কাজে লাগিয়ে গাছ-পালা সূর্যালোক এবং প্রকৃতিতে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ছেড়ে দেয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে তার খাবার তৈরি করে অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে। সে অক্সিজেন ব্যবহার করে আমরা প্রাণীরা বেঁচে আছি। দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিতে প্রতিটা ক্ষেত্রেই দাতা-গ্রহীতার খেলা। এই খেলায় গ্রহীতা দান গ্রহন করে বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু দাতা দান করে কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত তো হচ্ছেই না বরং আরো শক্তি সঞ্চয় করে আরো দান করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, দাতা-গ্রহীতার এই প্রক্রিয়া জোড়দার করা ছাড়া মানব জাতি টিকে থাকতে পারবে না। এই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তশালী জাতি বা লোকটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাকেও সবচেয়ে দুর্বল খ্যাত কথিত নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমে বানানো অট্টালিকায় বসবাস আর রাস্তা-ঘাটে চলাচল করতে হয়।

তৃতীয়ত, প্রকৃতিতে দাতা থাকছেন উচ্চ মর্যাদায় আর গ্রহীতা থাকছেন কৃতজ্ঞ। গ্রহীতা দাতার কোন ক্ষতিই করে না বা করতে পারে না বরং দান করে যেন দাতার আরো শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গাছ-পালাকে দান করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিজে গ্রহন করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখছে এবং গাছ-পালা নিজেও প্রকৃতিতে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

চতুর্থত, দাতা-গ্রহীতার এই ধারা যেন প্রশান্তি আর শান্তনার অনিবার্য বিষয়। পিতা-মাতা সর্বস্ব ত্যাগ করে কোন রকম প্রতিদানের আশা ছাড়াই সন্তানকে বড় করে গড়ে তুলে প্রশান্তি পাচ্ছে আর সন্তান-সন্ততিরও উচিৎ বড় হয়ে বাবা-মার সেবা করে তাদের শান্তনার জবাব দেয়া। এভাবে দান-প্রতিদানের ধারাবাহিকতা পৃথিবীকে সোন্দর্যমন্ডিত করে তুলছে।

পঞ্চমত, দাতা-গ্রহীতার এই নিয়মে পাস্পরিক সহাবস্থান, ভালবাসা ও সামাজিক বন্ধন মজবুত করছে। চিকিৎসক তার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে রোগীর চিকিৎসা করছে আর রোগী প্রতিদান হিসেবে কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি কিছু বিনিময় বা অন্য কিছু দিয়ে চিকিৎসককে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকায় সহযোগিতা করছে।

ষষ্ঠত, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে যা চরম সত্য তা হল বেঁচে থাকার জন্য খুব বেশী সম্পদের প্রয়োজন নেই। প্রায় ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সময় অধিকাংশ সম্পদ ভোগ না করেই মারা যায়। এ ক্ষেত্রে তার পরবর্তী বংশধররা যোগ্য হলে তো ভাল আর অযোগ্য হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সম্পদ অপচয় করে বা অন্য ভাবে নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু মানুষ যদি নিয়মিতভাবে সম্পদের তিনভাগের একভাগ সম্পদ দান করে ট্রাস্ট গঠন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়, তাহলে তো এই দান সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে ফসল দিবে।

সপ্তমত, সব মানুষই চায় দুনিয়াতে সম্মান নিয়ে বাঁচতে আর অমর হয়ে থাকতে। সে ক্ষেত্রে দান-সাদাকায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারলে দুনিয়ায় সম্মান ও অমরত্ব না চাইলেও পেতে থাকবে অনাদিকাল পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ, প্রখ্যাত দানবীর হাজী মোহান্মদ মহসীনের নাম বিশ্ব জোড়া। ঐ সময়ে তার চাইতেও বেশী ধনী লোকের সংখা নেহায়েত কম ছিল না। অথচ তাদের নামও আমরা জানি না। আর কথিত নামি দামি মীর জাফর, ধনী ঘষেটি বেগম, উমি চাঁদ, জগতশেঠদের দুনিয়ার মানুষ স্মরণ করে ঘৃণা ভরে।

অষ্টমত, আল্লাহর কাছে সকল মানুষের জীবন-সম্পদ সমান হলেও দুনিয়ায় সম্মান, সম্পদ, স্বাস্থ্য, নানাবিধ যোগ্যতা কিংবা জ্ঞান-গরিমায় সকল মানুষ সমান নয়। এর কারণ আমরা প্রতিটা মানুষ অন্য মানুষের জন্য পরীক্ষা। যাকে যে যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, সে নিরিখে তার বিচার হবে। কাউকে ধনী করা কিংবা কাউকে গরীব করা মানে দুনিয়ার জীবনে পুরষ্কৃত করা বা অপমান করা নয় বরং সবটাই পরীক্ষা।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদের যাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা দিয়েই পরীক্ষা করে নিতে পারেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আল আন আম-১৬৫)।

ধনী কিংবা রাজনীতিকগন গরীবদের কাছে পরীক্ষা এই ভাবে যে তার পাওয়া সম্পদ ও ক্ষমতা দিয়ে দুর্বল উপকৃত হচ্ছে নাকি শোষিত হচ্ছে।

নবমত, দান-সাদাকা একটি উত্তম আমল। মানুষের প্রতি ভালবাসা আর মানবতার মূর্ত প্রতীক। এ জন্যই সকল ধর্ম এবং সমাজে দান-ছদকাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

দশমত, অধিকার হিসেবে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল হক্কুল্লাহ, অপরটি হল হক্কুল ইবাদ। সাদাকাহ প্রাপ্তি হল গরীব বান্দার হক। এই হক প্রদানে কোন ধরণের গাফলতি হলে কঠিন জবাবদিহীতার মধ্যে পড়তে হবে।

উত্তম দানের শর্তাবলীঃ

প্রথমত ঃ দান হতে হবে নিজের প্রিয় জিনিষের

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ –

"তোমাদের প্রিয় জিনিষের দান খরচ করা ছাড়া কখনই তোমরা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" (আল-ইমরান-৯২)।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করো না। আর, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত" (বাকারাহ-২৬৭)।

দ্বিতীয়ত ঃ দান হতে হবে শর্তহীন এবং কেবল মাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না"। (বাকারাহ-২৬৪)

এখানে বৃষ্টি বলতে মানুষের দান- খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে, মসৃন পাথর বলতে দানের আড়ালে বদ নিয়ত আর পাথরের উপর মাটির আস্তরণ (লোক দেখানো দান) যা সামান্য বৃষ্টিতে ধুয়ে পরিস্কার হয়ে মসৃণ পাথর সবার সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُ ِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَ ِيرٌ.

"আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা"। (সূরা আল বাকারাহ-২৬৫)

এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত বলতে এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার পেছনে থাকে চরম কল্যাণাকাংখা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর হাল্কা বৃষ্টিপাত বলতে কল্যাণ আকাংখার তীব্রতাবিহীন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয়তঃ দান হতে হবে শয়তানের প্ররোচনা মুক্ত ভেজালহীন

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় (দান করার ক্ষেত্রে) এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (বাকারাহ- ২৬৮)।

চতুর্থত ঃ দান করতে হবে দানের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দানযোগ্য ব্যক্তিকে

এখানে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি কারা-

১. যে ব্যক্তি একবারেই নিঃস্ব, উপার্জন ক্ষমতাহীন, যার সাহায্য করার মত আর কেউ নেই-এমন ব্যক্তিবর্গ।

২. অগ্রাধিকারযোগ্য ব্যক্তি হল উপার্জন করার শক্তি সামর্থ সবই আছে কিন্তু দ্বীন বা মানবতার জন্য কাজ করতে গিয়ে উপার্জনের জন্য সময় দিতে পারে না।

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْ ِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

"বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না" (বাকারাহ-২৭৩)।

৩. ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা মানবিক শিক্ষা-চিকিৎসার খরচ চালাতে অসমর্থ।

৪. ব্যক্তি এক সময় সামর্থবান ছিল কিন্তু সংগত কারণে মামলা-হামলা বা অন্য ঝামেলায় পড়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কিংবা সফরকালীন সময়ে সাময়িক সময়ের জন্য টাকা ফুরিয়ে গেছে এবং বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই ইত্যাদি।

পঞ্চমত ঃ দান করে খোটা দেয়া, গ্রহীতার নিকট প্রতিদান আশা করা বা কষ্ট দেয়া মানে দানের সমস্ত প্রাপ্তিকে নষ্ট করা

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾

"সুন্দর বাচনে কথা বলা ও কোন বিষয়ে উদারতা দেখিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করা সেই দান অপেক্ষা উত্তম যে দানে আনে কষ্ট-যন্ত্রণা। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল" (বাকারাহ-২৬৩)।

﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার জন্য খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিতও হবে না" (বাকারাহ- ২৬২)।

ষষ্ঠতঃ দান হতে হবে সময়োপযোগী এবং মৃত্যুর পুর্বেই, কারণ মৃত্যুর সময় এসে যাবার পর কাউকেই এক রত্তি পরিমান অবকাশ দেয়া হবে না

﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

"আর আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। কেননা তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সাদাকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম" (মুনাফিকুন-১০)।

﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

আর আল্লাহ কখনো কোন প্রাণকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত (মুনাফিকুন-১১)।

সপ্তমতঃ দান হতে হবে সম্পদের মোহ আর সন্তান-সন্ততির মাত্রাতিরিক্ত মায়া ত্যাগ করে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত" (মুনাফিকুন-৯)।

সর্বোত্তম দান কোনটি?

এখন প্রশ্ন হতে পারে কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সৎ কাজ হিসেবে গণ্য। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের পাশাপাশি সহীহ নিয়ত ও আল্লাহ এবং রাসুলের দেয়া নিয়ম মেনে সর্বাত্বক চেষ্টায় রত যে কোন পরিমান আল্লাহ ঘোষিত কাজকেই সৎ কাজ বুঝায়। ইসলামে সৎ কাজ হিসেবে পুরস্কার পেতে কমপক্ষে চারটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, ঈমান, দ্বিতীয়ত, খালেস নিয়ত, তৃতীয়ত, আল্লাহ এবং রাসূল (সা) দেখানো পথে কাজ করা এবং চতুর্থত, কাজ বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। এই নিয়মে কাজের কোন সফলতা পাওয়া বা না পাওয়া আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির কোন শর্ত নয়। উপরোক্ত চারটি শর্ত মেনে যে কোন ব্যক্তি যে কোন পরিমান দান সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে যখন এমনভাবে করে যে অন্য কেউ টের পায় না, তখন পরিমান যাই হোক না কেন, তাই সর্বোত্তম দান হিসেবে গণ্য হবে।

"আপনার প্রয়োজন থাকা সত্বেও আপনি নিজে ত্যাগ করে দান করবেন, আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করবেন, সাদাকা করবেন, আর এই সাদাকা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সাদাকা" (আল হাদিস)।

জীবিত ব্যক্তি কি কি দান করতে পারে?

জীবিতাবস্থায় ব্যক্তির দানকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি। জ্ঞান দান, অর্থ-সম্পদ দান, উত্তম জীবনাদর্শ দান এবং উত্তম বংশধারা বা সন্তান-সন্ততি দান। প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় চাইলেই পৃথিবীবাসীকে চারটির চারটিই অথবা যে কোন একটি দান করে ধন্য হতে পারে।

জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম অসিয়ত পূরণ, তার উত্তম আদর্শ বাস্তবায়ন, দোয়া এবং দান-খয়রাত করে ধন্য হতে পারেন। তবে মৃতব্যক্তির জন্য উত্তম বদলা এবং সবচেয়ে উপকারী প্রাপ্তি হল তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদাকা করা।

মৃত ব্যক্তি জীবিতকে কোন কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তবে তারা নিজেরা উত্তম প্রতিফল কিয়ামাত পর্যন্ত পেতে থাকেন যদি মৃত্যুকালীন সময়ে উত্তম আদর্শ ও আদর্শবান সন্তান রেখে যান অথবা অর্থ-সম্পদ দান করে যান বা এমন জ্ঞান ভান্ডার রেখে যান যার ফল সুদূর প্রসারি।

সাদাকায়ে জারিয়াঃ

সাদাকার ফলাফল প্রাপ্তির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সাদাকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ সাদাকা যা অস্থায়ী এবং সাদাকায়ে জারিয়া যার ফলাফল স্থায়ী। উত্তম দান হচ্ছে সাদাকায়ে জারিয়া। সব সাদাকা সাদাকায়ে জারিয়া নয়।

সাদাকায়ে জারিয়া আরবী শব্দ। সাদাকা শব্দের অর্থ দান করা এবং জারিয়া অর্থ প্রবহমান, সদাস্থায়ী প্রভৃতি।

সাদাকায়ে জারিয়া হলো- এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যত দিন এর কার্যক্রম থাকবে তত

দিন পর্যন্ত কবরে শুয়ে শুয়ে সাদাকাকারী ব্যক্তি এর সওয়াব পেতেই থাকবে। বিধায় প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাদাকায়ে জারিয়ার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।

সাদাকায়ে জারিয়া স্থায়ী ও অবিনিময়যোগ্য দান। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সামাজিক ও সামষ্টিক পরোপকার। পরোপকার সাধারণত দু ভাবে করা যায় : ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু করলে বৃহত্তরভাবে পরোপকার করা যায়। যেমন কেউ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করল আর কেউ শুধু একজন রোগীকে সেবা দিল। এক্ষেত্রে হাসপাতালের মাধ্যমে এরকম বহু রোগীর সেবা করা সম্ভব। রাসূল সা. বলেছেন, দুটি জিনিস মানুষের উন্নতির উপকরণ। একটি 'উত্তম সন্তান', অন্যটি সাদাকায়ে জারিয়া।

"যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া; সাদাকায়ে জারিয়া, কিংবা এমন জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় কিংবা এমন সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৩১)

"একজন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমলনামায় যা থেকে নেকি যোগ হবে তা হলো- যদি সে শিক্ষা অর্জনের পর তা অপরকে শিক্ষা দেয় ও প্রচার করে, অথবা সৎ সন্তান রেখে যায়, অথবা ভালো বই রেখে যায়, অথবা মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, অথবা মুসাফিরের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে, অথবা খাল-নদী খনন করে দেয় অথবা জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য সম্পদ থেকে সাদাকা করে।" -(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪২)।

"যে ইসলামে কোনো উত্তম নিয়ম চালু করে, যে অনুযায়ী পরবর্তীতে আমল করা হয়, তার জন্য আমলকারীদের অনুরূপ সওয়াব লেখা হবে। তাদের সাওয়াব সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না। আর যে ইসলামে কোনো মন্দ নিয়ম চালু করে, যে অনুযায়ী পরবর্তীতে আমল করা হয়, তার জন্য আমলকারীদের অনুরূপ গোনাহ লেখা হবে। তাদের গোনাহ কিছুমাত্রও কমানো হবে না"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০১৭)।

অর্থাৎ সাদাকায়ে জারিয়া যেমন আছে তেমনি গুনাহে জারিয়াও আছে।

"কোনো মুসলিম যদি বৃক্ষরোপণ করে এবং তার কোনো ফল কোনো ব্যক্তি খায় তবে ওই ফল তার জন্য সাদাকা, কোনো ভয়ংকর জন্তু-জানোয়ার খেলেও তা তার জন্য সাদাকা, যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করেও খায় তা তার জন্য সাদাকা, কোনো পাখিও খায় তাও তার জন্য সাদাকা। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি তা কেটে ফেলে তাও তার জন্য সাদাকা"। (মুসলিম)

রক্ত, কিংবা অংগ দান করা, বৃক্ষ রোপন, মানবতার কল্যানে সহায়-সম্পদ ওয়াকফ করা, এতিমের লালন-পালনের দায়িত্ব নেওয়া, মসজিদ নির্মাণ কিংবা মসজিদের প্রয়োজনীয় আসবারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা, প্রয়োজনীয় এলাকায় পানীয় জলের জন্য খাল খনন, কূপ খনন, কুরআন শিক্ষা দেওয়া বা কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থা করা, অসহায়-দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থায় হাসপাতাল নির্মাণ কিংবা চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, কবরস্থানের জন্য জমি দান করা কিংবা জমি ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা করা। মৃতদের সৎকারের খরচ জোগানো কিংবা বহনের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ে সাহায্য করা, মুসলমানদের কল্যাণে আসে এমন

ইসলামি বই-তাফসির, হাদিস, ফিকাহ শাস্ত্রের বই-পুস্তক মুদ্রণ কিংবা বিতরণে সহায়তা করা, অত্যাচারিত মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানো, ভাল কাজ করা এবং ভাল কাজে উৎসাহ দেয়া ইত্যাদি সবই সাদাকায়ে জারিয়া।

শুধু মানুষই নয়, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সব সৃষ্টির কল্যাণে যে কোনো জনহিতকর কাজই সাদাকায়ে জারিয়া হতে পারে যদি তা চলমান থাকে।

এমনকি নিঃস্বার্থ যে কোনো কল্যাণকর কাজই হতে পারে সাদাকায়ে জারিয়া। যাতে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি স্বার্থ উদ্দেশ্য না থাকে।

দানের উপকারিতা

১. দান সম্পদ বৃদ্ধির কারণ : দান করে কেউ দেউলে হয়েছে এমন উদাহরণ জগতে একটিও নাই। বরং দান না করে, সম্পদের অপচয় করে ধ্বংশ হয়ে গেছে এমন উদাহরণ আছে ভুরি ভুরি। দান-সাদাকার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না; বরং দানের মাধ্যমে সম্পদের অতুলনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটে। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন কোনো দিন যায় না যেদিন দুজন ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন না, তাদের একজন দানশীল ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর মালের বিনিময় দান করুন (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি করুন), দ্বিতীয় ফেরেশতা কৃপণের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করে বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন।' (বুখারি : ১৪৪২; মুসলিম : ১০১০)। 'দান-সাদকা সম্পদ বৃদ্ধি বৈ কমায় না।' (মুসলিম : ২৫৮৮)

২. মানুষের জীবন আছে কিন্তু বিপদাপদ নেই এমন কিন্তু কখনও হয় না। দান-সাদাকার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়। দানকারীর জন্য বিপদের সামনে দান তার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা অতিসত্বর দানের দিকে ধাবিত হও, কেননা বিপদাপদ দানকে অতিক্রম করতে পারে না।' (শুয়াবুল ঈমান : ৩০৮২; আত তারগিব : ১২৯৯)। এমনকি পাপাচারী এবং কাফেরের দানেরও প্রভাব রয়েছে।)

৩. দান-সাদাকাহ প্রভূত কল্যাণ এবং অনেক পাপ মিটিয়ে দেয়। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, আমি নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি বললেন, হে মুয়াজ! আমি কি তোমাকে প্রভূত কল্যাণ লাভের পথ বাতলে দেব না? অতঃপর নবীজি (সা.) বললেন, রোজা ঢালস্বরূপ আর সদকা পাপকে মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (তিরমিজি : ২৬১৬; ইবনে মাজা : ৩৯৭৩)

৪. দান-সাদাকা পবিত্রতার প্রতীক, আত্মশুদ্ধির মাধ্যম ও সৎ কাজের বৃদ্ধিকারক।

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার" (তাওবা: ১০৩)।

৫. রোগ নিরাময় করে : হজরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মধ্যকার অসুস্থ ব্যক্তিদের দানের মাধ্যমে চিকিৎসা কর। (বায়হাকি : ৬৫৯৩)

৬. দান করলে আল্লাহ তায়ালা দানকারীর হায়াত বাড়িয়ে দেন। আমর ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির সাদাকা তার হায়াত বৃদ্ধি করে। (তাবারানি, হাদিস : ৩১)। ইমাম নববী রহ. 'হায়াত বৃদ্ধি'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দান করবেন, ফলে অল্প সময়েও অধিক ইবাদত-বন্দেগি করার তওফিক লাভ হবে।

৭. গুনাহ করার পর গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করলে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায় এবং তার ক্ষমা লাভের পথ সহজ হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সাদাকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে।' (তিরমিজি : ৬৬৪; ইবনে হিব্বান : ৩৩০৯)

৮. দান-সাদাকা দানকারী ব্যক্তিকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সদকা অপমৃত্যু রোধ করে।' (তিরমিজি : ৬৬৪; ইবনে হিব্বান : ৩৩০৯)।

৯. হাশরের ময়দানে সূর্যের প্রখর উত্তাপের সময় আল্লাহর আদেশে দান-সাদকাকারীকে ছায়া দেওয় হবে। উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হাশরের ময়দানে মানুষের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক দানকারী ব্যক্তি তার সদকার ছায়ার আশ্রয়ে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ : ১৭৩৩৩; ইবনে হিব্বান : ৩৩১০)

১০. আরশের নিচে ছায়া পাবে ঃ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দেবেন। তাদের এক শ্রেণি হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে দান করেছে যে তার বাম হাত জানতে পারেনি তার ডান হাত কী দান করেছে। (বুখারি : ৬৬০; মুসলিম : ১০৩১) ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্টোপ্যাথলজী, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, মোবাইলঃ ০১৯৭০৬৫৩৭৪৯, towhid.drhossain@gmail.com

চিন্তাধারা

সালিশিঃ বিবাদ মীমাংসার এক অনুপম ব্যবস্থা

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

'সালিশি' শব্দটি আরবি 'সালেশ' শব্দ থেকে এসেছে যার আভিধানিক অর্থ তৃতীয়। এটি হচ্ছে এমন এক অনানুষ্ঠানিক সভা বা বৈঠক যেখানে এক বা একাধিক সালিশ বিবাদরত দলের মাঝে একটি সন্তোষজনক চুক্তিতে পৌঁছতে সাহায্য করেন। সংক্ষেপে, সালিশি ব্যবস্থা হচ্ছে কলহ-বিবাদ মেটানোর একটি সহজ ও সামাজিক পদ্ধতি। ইংরেজিতে একে Conciliation বলা হয়।

সমাজ বিজ্ঞানীগণের মতে-

Conciliation is a process and not an end result. It is also an art and not a science. It involves specific techniques and methods which can be taught (at least not within a short period of time): empathy; sensitivity; compassion; the ability to listen and hear; a sense of timing; or intuition.

উল্লেখ্য, সালিশির মাধ্যমে অনেক কঠিন সমস্যারও যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। আর তাই অধুনা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে তাঁকে চলতে হয়। চলার পথে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অনেক ভাল-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হন। প্রায়শ তিনি ভুল করেন। এ ভুল হয় কখনো বুঝে, কখনো না বুঝে; কখনো ইচ্ছায় আবার কখনো বা অনিচ্ছায়। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি বিবেক অপেক্ষা আবেগ দ্বারা বেশী তাড়িত হন। আবেগ বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন না করেও তখন তা আত্মবিধংসী ক্ষেপণাস্ত্রের মতোই ক্রিয়া করে। এটি পরম সত্য। কেবল বিবেকের বিবেচনাই তাঁকে রাহুমুক্ত করতে পারে। এ বিবেচনাবোধ যখন তাঁর লোপ পায় সেই মুহূর্তে তিনি আর মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন না। আর তখনই তিনি ভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী হন।

আসলে মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণেই মানুষ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণভাবে একজন মানুষের ভেতরে একচেটিয়া মনুষ্যত্ব বা একচেটিয়া পশুত্বের সমাবেশ তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার তাঁরা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, প্রয়োজনীয় পরিচর্যা, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব হৃদয় রাজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন দুঃসাধ্য নয়। তখন তাঁর ভেতরকার পশুত্ব অবদমিত হয়ে তা সোনালী আভায় ঝিকমিক করে উঠে। এটি শুধু মানুষের বেলাতেই সম্ভব বলে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, সৃষ্টি কুলের মাঝে একমাত্র মানুষই বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণি।

মানুষ যখন ভুল করে, ভুলের পথ বেয়ে অন্যায় অনাচার করে তখন সঙ্গত কারণেই এর প্রতিকারের প্রশ্ন উঠে। প্রতিকার প্রত্যাশা করে বিচার। সভ্যতা সংরক্ষণের জন্যই অপরাধের বিচার হওয়া দরকার। এভাবে ভাবলে খুবই যথার্থ হয় যে, বিচারটুকু অপরাধের জন্য নির্ধারিত: অপরাধী তার বাহক বিধায় তিনি এর প্রাপ্য।

এবার বিচার নিয়ে কথা বলা যাক। বিচার প্রসঙ্গে বলতে গেলেই দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ বিচার ব্যবস্থার কথা এসে যায়। আমাদের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে রচিত। সে যুগ বাসি হয়েছে। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটগত আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। তথাপি সেকেলে বিচার পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি।

বিচার প্রাপ্তির জন্য দ্বারস্থ হতে হয় আইন আদালতের। নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে টাকা পয়সা খরচ করে মামলা পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাঁরা না পারেন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করতে, না পারেন থানা পুলিশের ধকল সামলাতে, না পারেন যথাযথভাবে মামলার তদ্বির করতে। এসব মানুষ দৈনিক কাজ কর্ম পরিত্যাগ করে নিয়মিতভাবে আদালতে হাজির হতে পারেন না।

প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় এতসব ঝক্কি-ঝামেলা বিশেষ করে গরীব মানুষের ভোগান্তির পটভূমিতেই সালিশি তথা অপ্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতার প্রতি গণমানুষের নজর নিবদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সালিশির উদ্ভব বহু পূর্বে। গ্রামীণ মানুষেরা মজ্জাগতভাবেই সহজ, সরল, উদার, ধর্মভীরু এবং অপকৃণ চিত্তাধিকারী। তাঁরা ঝামেলায় সহজে নিজে জড়ান না, কাউকে জড়াতেও চান না। পরিবার, পাড়া, গ্রাম বা ইউনিয়নে কোন বিবাদ-বিরোধ দেখা দিলে তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেরাই একত্রে বসে এর একটা সুষ্ঠু সুরাহা করতে আগ্রহী হন। এ প্র্যাকটিস সুদূর পূর্ব থেকেই চলে আসছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এক সময়ে এ দেশে 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তাঁরা সামাজিক আপোস-রফায় প্রতিনিধিত্ব করতেন। এখনো এর কার্যকারিতা কালে-ভদ্রে অঞ্চলভেদে লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত আইন আদালত আঙ্গিনার রূঢ় বাস্তবতার আলোকে এর আবেদন সবাই আরও প্রবলভাবে অনুভব করছেন। নগরে নাগরিকরাও ক্রমশ এ ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছেন।

সালিশির সুবিধাসমূহঃ

ক. এতে বিবাদটির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়;
খ. উভয় পক্ষ খুশি এবং পারস্পরিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকেন;
গ. অহেতুক ভোগান্তির শিকার হতে হয় না;
ঘ. বিবাদ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা থাকে না;
ঙ. অর্থ কষ্ট হয় না;
চ. ঘটনার খবর বেশী দূর গড়ায় না, গোপনীয়তা বেশী রক্ষিত হয়;
ছ. সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সচরাচর কোন পক্ষই দ্বিধান্বিত হন না;

সালিশির পদ্ধতিঃ

সালিশি করার একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু পদ্ধতি আছে। এতে বিবদমান উভয় পক্ষকেই উপস্থিত থাকা জরুরী। সালিশ হিসেবে পক্ষদ্বয়ের কাছে আস্থাবান ও প্রকৃত নিরপেক্ষ চরিত্রের সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রামীণ পর্যায়ে ইউপি নেতা, চেয়ারম্যান, মেম্বার, মাতব্বর, মোড়ল, ধর্মীয় নেতা, প্রভাবশালী অথচ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গকে উপস্থিত করাতে হয়। এঁদের মাঝে একজন সভাপতি হন। তাঁর নেতৃত্বে সালিশি পরিচালিত হবে। বিবদমান উভয় পক্ষেরই সালিশি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে স্বাধীন ও নি:শর্ত সম্মতি থাকবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ জোর জবরদস্তি চলবে না। সালিশ ও সালিশি অনুষ্ঠানের স্থানের ব্যাপারে পক্ষদ্বয়ের আপত্তি থাকবে না।

শুরুতেই সভাপতি ভূমিকা বক্তব্য দেবেন। অত:পর পক্ষদ্বয় পৃথক পৃথকভাবে স্ব স্ব বক্তব্য বা অভিযোগ প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত ও বাধাহীনভাবে সবার সামনে উপস্থাপন

করবেন। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই তাঁদের ভাবাবেগ বা ক্ষোভ প্রকাশের অবারিত ও সমান সুযোগ দেয়া হবে। দু পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনার পর বিজ্ঞ সালিশগণ বিরোধের মূল কারণটি চিহ্নিত করবেন এবং তাঁদের সার্বিক বিবেচনা অনুযায়ী এর একটি সম্মানজনক, সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত প্রদান বা চুক্তির প্রস্তাব দেবেন। এ সিদ্ধান্ত বা চুক্তিটিই হচ্ছে বিবাদের সমাধান তথা বিরোধের নিষ্পত্তি।

সালিশি কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়। এটিকে বলা হয় মীমাংসা পত্র বা 'সালিশনামা'। মীমাংসা পত্র বা সালিশনামায় সালিশি সংঘটনের স্থান, তারিখ, সময়, সভাপতির পূর্ণ নাম, বিবাদের বিবরণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সভাপতিসহ সালিশগণের স্বাক্ষর থাকবে। এর কপি পক্ষদ্বয়কে সরবরাহ করা হয়।

মীমাংসা পত্র বা সালিশনামা তৈরির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সালিশির পরও অপ্রত্যাশিতভাবে বিরোধ বা অভিযোগটি যদি কখনো আদালত পর্যন্ত গড়ায় তখন এটি একটি সাক্ষ্য হিসেবে আদালতের কাছে বিবেচিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আর তাই সালিশি সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা পত্র বা সালিশনামা লেখা উচিত।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সালিশগণ বিচারক নন, তাঁরা গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পক্ষদ্বয়কে অনুরোধ করবেন মাত্র। কখনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবেন না। সুপারিশকৃত সিদ্ধান্তে কোন এক পক্ষের গররাজি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় বিষয়টি প্রচলিত আইনানুগ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার কথা ভাবতে পারেন।

যদিও হত্যাকান্ড, ধর্ষণ,অপহরণ, ডাকাতি, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার সহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধসমুহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সালিশি আইনত: প্রযোজ্য হবে না; তথাপি অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নিষ্পত্তিযোগ্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরনের বহু বিরোধই সালিশির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা পেয়েছে। এমনকি উভয় পক্ষই চলমান মোকদ্দমা প্রত্যাহার করে পারস্পরিক অকৃত্রিম হৃদ্যতায় হাস্যোজ্জ্বল সৌরভে সহাবস্থান করার নজির স্থাপন করেছে সালিশির বদৌলতে।

শ্রম আইনে সালিশি:

আমাদের দেশ জুড়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক কল-কারখানা, মিল, দোকান-পাট, ট্রেডিং হাউস, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলোতে দিবা-নিশি শ্রমিক ভাই-বোনেরা কাজ করেন। কাজ করতে গিয়ে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে প্রায়শ নানা ইস্যুতে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ফলে শিল্প-সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে সালিশি অনিবার্য হয়ে উঠে বিধায় বাংলাদশ শ্রম আইনে সালিশিকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর চর্তুদশ অধ্যায়ে বিবাদ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ আইনে সরাসরি শ্রম আদালতে না গিয়ে সালিশি ও মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তিকল্পে নিম্নরূপ আইনী বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে্।

ধারা ২১০। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি:

(১) যদি কোন সময়ে কোন মালিক বা যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধি দেখিতে পায় যে, মালিক এবং শ্রমিকগণের মধ্যে কোন বিরোধ উত্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উক্ত মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি তাহার বা উহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া অন্য

পক্ষকে লিখিতভাবে জানাইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে পত্র প্রাপক, অন্য পক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে, পত্রে উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যৌথ দরকষাকষি শুরু করিবার জন্য তাহার সহিত একটি সভার ব্যবস্থা করিবেন, এবং এইরূপ সভা এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উভয় পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যেও অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৩) যদি পক্ষগণ উক্তরূপ আলোচনার পর আলোচিত বিষয়ের উপর কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হন, তাহা হইলে একটি নিষ্পত্তিনামা লিখিতে হইবে এবং উহাতে পক্ষদ্বয় দস্তখত করিবেন, এবং উহার একটি কপি মালিক কর্তৃক সরকার (মহাপরিচালক) এবং সালিশের নিকট প্রেরিত হইবে।

(৪) যদি -

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রেরিত কোন পত্রের প্রাপক অন্য কোন পক্ষের সহিত উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সভার ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত অন্য পক্ষ, অথবা

(খ) উভয় পক্ষের পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ অথবা নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম সভার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতি অনুযায়ী বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হওয়া না যায়, তাহা হইলে যে কোন পক্ষ, উপ-ধারা (২) অথবা, ক্ষেত্রমত, এই উপ-ধারার দফা (খ) এ উল্লিখিত সময় সীমা শেষ হইবার পনের দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত উপযুক্ত সালিশকে (Conciliation) অবহিত করিতে পারিবেন এবং বিরোধটি সালিশির (Conciliation) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য তাহাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৫) এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালিশ (Conciliator) নিযুক্ত করিবেন, এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন সালিশির (Conciliation) জন্য কোন অনুরোধ এই উপ-ধারার অধীন সংশ্লিষ্ট এলাকা বা প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য নিযুক্ত সালিশ (Conciliator) গ্রহণ করিবেন।

(৬) উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্ত হইবার দশ দিনের মধ্যে সালিশ (Conciliator) তাহার সালিশি কার্যক্রম (Conciliation) শুরু করিবে, এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের সভা আহবান করিবেন।

(৭) বিরোধের পক্ষগণ স্বয়ং অথবা তাহাদের মনোনীত এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তি সম্পাদন করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিশ (Conciliator)-এর নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে হাজির হইবেন।

(৮) যদি সালিশির (Conciliation) ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি হয় তাহা হইলে, সালিশ (Conciliator) তৎসম্পর্কে সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন, এবং ইহার সহিত উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিষ্পত্তিনামার একটি কপিও প্রেরিত হইবে।

(৯) যদি সালিশ (Conciliator) কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বিরোধটি নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে সালিশি কার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হইবে, অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিক্রমে আরো অধিক সময় চালানো যাইবে।

(১০) যদি সালিশি কার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সালিশ (Conciliator) উভয় পক্ষকে বিরোধটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উহা কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণ করিবার জন্য রাজী করাইতে চেষ্টা করিবেন।

(১১) যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণে রাজী না হন, তা হইলে সালিশ (Conciliator), সালিশ কার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে, উহা ব্যর্থ হইয়াছে- এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র পক্ষগণকে প্রদান করিবেন।

(১২) যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণ করিতে রাজী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের স্বীকৃত কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য যৌথ অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিবেন।

(১৩) উপ-ধারা (১২) তে উল্লিখিত মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) সরকার কর্তৃক এতদ-উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মধ্যস্থতাকারীর তালিকা হইতে কোন ব্যক্তি হইতে পারিবেন, অথবা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য যে কোন ব্যক্তি হইতে পারিবেন।

(১৪) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) মধ্যস্থতার অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা পক্ষগণ কর্তৃক লিখিতভাবে স্বীকৃত কোন বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাঁহার রোয়েদাদ প্রদান করিবেন।

(১৫) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) তাঁহার রোয়েদাদ প্রদানের পর উহার একটি কপি পক্ষগণকে এবং আরেকটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১৬) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

(১৭) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) কর্তৃক নির্ধারিত অনধিক দুই বৎসর পযর্ন্ত কোন রোয়েদাদ বৈধ থাকিবে।

(১৮) [মহাপরিচালক], কোন বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন সময় সালিশ (Conciliator) এর নিকট হইতে কোন সালিশি কার্যক্রম উঠাইয়া আনিয়া নিজেই উহা চালাইয়া যাইতে পারিবেন, অথবা অন্য কোন সালিশ (Conciliator), এর নিকট উহা হস্তান্তর করিতে পারিবে, এবং এক্ষেত্রে এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(১৯) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ সম্পর্কে কোন মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে, সে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি শিল্প বিরোধ সম্পর্কে উক্ত মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ফেডারেশনের সহিত যোগাযোগ করিবে, এবং উক্তরূপ মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পাদিত শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোন চুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের সকল মালিক ও শ্রমিকগণের উপর অবশ্য পালনীয় হইবে।

শিশু আইনে বিরোধ মীমাংসা

শিশু আইন, ২০১৩-এ শিশু-কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত লঘু প্রকৃতির অপরাধসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সরাসরি আদালতে যাওয়ার পরিবর্তে প্রবেশনে কর্মকর্তাগণকে দ্বিপাক্ষিক বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ধারা: ৩৭। বিরোধ মীমাংসা:-

(১) শিশু-আদালতের বিবেচনায় কোন শিশু লঘু প্রকৃতির অপরাধ সংঘটন করলে, উক্ত আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এবং উক্ত ক্ষেত্র ধারা ৪৯ (পারিবারিক সম্মেলন আয়োজন) এর বিধান, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হবে।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা, শিশু-আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে, সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার নিমিত্ত কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করবেন এবং তদনুসারে বিরোধ মীমাংসা করবেন এবং উহা, যথাশীঘ্র সম্ভব, শিশু-আদালতকে অবহিত করবেন।

(৩) শিশু-আদালত উপ-ধারা (২) অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পর বিষয়টির ওপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করবে এবং উহার ওপর করণীয়, যদি থাকে, সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করে অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন নির্দেশনা জারি করা হলে, অধিদপ্তর উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত: উহার অগ্রগতি প্রতিবেদন আদালতকে অবহিত করবেন।

পারিবারিক আইনে সালিশি:

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১- এর ৬ ধারায় বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সালিশি পরিষদের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। একই আইনের ৭ ধারায় তালাকের ক্ষেত্রে সালিশি পরিষদ গঠন করে উভয়পক্ষের মধ্যে পুর্নমিলন ঘটানোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আবার উক্ত আইনের ৯ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রী বা স্ত্রীদের ভরণপোষণ যথাযথভাবে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ঐ স্ত্রী বা স্ত্রীদের ভরণপোষণ প্রদানের জন্য একটি সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বহুবিয়ে, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে গঠিত সালিশি পরিষদ এবং ২০০৬ সালে গঠিত গ্রাম আদালত এক বিষয় নয়। গ্রাম আদালত একটি আনুষ্ঠানিক আদালত, অপরদিকে সালিশি পরিষদ একটি অনানুষ্ঠানিক সামাজিক ব্যবস্থা।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫- এর ১০ ধারায় বলা হয়েছে, পারিবারিক আদালতের বিচারাধীন পাঁচটি বিষয়ের যে কোন বিষয়ে (তালাক, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, দেনমোহর ও দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার) আদালতে মামলা দায়ের করা হলে বিচারের পূর্বে আদালতে পক্ষগণ সম্মত থাকলে সালিশির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও আপস, সালিশি কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার রীতি বিদ্যমান আছে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব শর্ত হলো পক্ষরাষ্ট্র সমূহের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। দুই বিরোধী পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র বা কোন

আন্তর্জাতিক সংগঠন বা কোন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সালিশি প্রসঙ্গে ইসলাম:

ইসলামেও পারস্পরিক বা দ্বিপাক্ষিক এমনকি ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বিবাদ- বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশি কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; অত:পর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে - যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সুরা হুজরাত, আয়াত-৯)

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা দুই ভাই এর মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (সুরা হুজরাত, আয়াত: ১০)

রাসুল (সা:) বলেছেন -

হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা:) আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সা: থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই: রাসুল সা: বলেছেন: "(পূর্ববর্তী যমানায়) এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি থেকে এক খন্ড যমীন খরিদ করলো। যমীন ক্রেতা উক্ত যমীনের ভেতর স্বর্ণের একটি কলসী পেয়ে গেলো। তখন যমীন ক্রেতা বিক্রেতাকে বললো, তুমি আমার থেকে তোমার স্বর্ণ নিয়ে যাও। আমি তো তোমার থেকে যমীন খরিদ করেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। (কাজেই স্বর্ণের মালিক তুমি।) তখন যমীন বিক্রেতা বললো, আমি তোমার কাছে যমীন এবং তাতে যা কিছু রয়েছে সবই তো বিক্রি করেছি। (কাজেই তুমিই স্বর্ণের মালিক।) এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলো। (তাদের কেউই স্বর্ণগুলো গ্রহণ করতে রাজী নয়।) রাসুল সা: বলেন, অত:পর তারা উভয়ে এক ব্যক্তির নিকট এর ফয়সালা চাইলো। যার কাছে ফয়সালা চাইলো সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কি সন্তান আছে? তাদের একজন বললো, আমার একটি ছেলে আছে। অপরজন বললো, আমার একটি মেয়ে আছ। তখন সালিশ বললেন, তোমার মেয়েটিকে ছেলেটির কাছে বিয়ে দিয়ে দাও এবং স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ তাদের জন্যে খরচ করো; আর (বাকীটা) তাদের দিয়ে দাও।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৪৩৪৮, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।)।

আদর্শ সালিশির পর্যায়ক্রমিক ধাপ

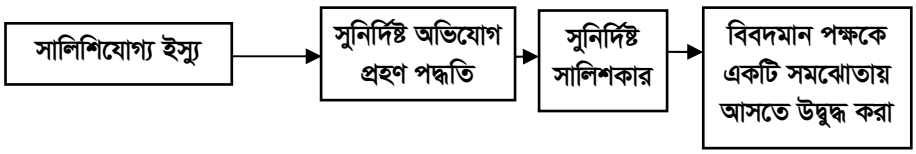

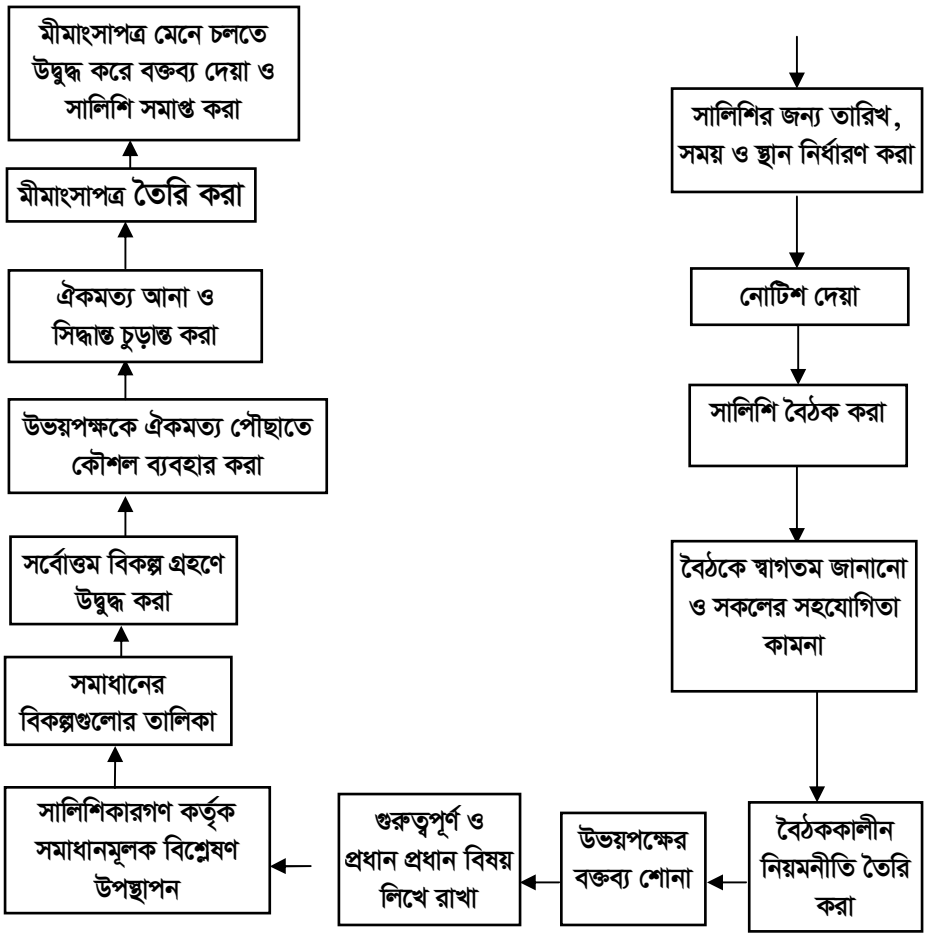

[সূত্র: 'আইনের কথা' পুস্তিকামালা, ডিসেম্বর, ২০২০, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক।]

পরিশেষে বলা যায় যে, মায়াময় এ জগৎ বড়ই ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এ জগতে আমরা মুসাফির। জগৎ সংসারে বিবাদ-বিরোধ- বিসম্বাদ থাকবেই। এটি যেন অনেকটাই অবধারিত। বিবাদ বা বিরোধ থেকে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে জিঘাংসা বা প্রতিশোধস্পৃহা আমাদেরেকে অহর্ণিশ গ্রাস করতে থাকে। আর এ থেকে মুক্তির পথ হলো যখনই কোন বিবাদ-বিরোধ দেখা দেবে তখনই তা একান্ত অসম্ভব না হলে গ্রহণযোগ্য কোন তৃতীয় পক্ষের সহায়তা নিয়ে উদার চিত্তে স্বল্প সময়ের মধ্যে মীমাংসা করা বা মিটিয়ে ফেলার শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করা। আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সুখময়, প্রশান্তময় সর্বোপরি কল্যাণময় করে তোলার জন্য এটি প্রয়োজন। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ হাজ্জ কি এবং কত প্রকার? হাজ্জ পালনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানতে চাই।

আজহারুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর ঃ হাজ্জ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি শর্ত সাপেক্ষে কা'বা ঘরের হাজ্জ করা ফারয করেছেন। শর্ত হলো, কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকা। এখানে সামর্থ্যের উদ্দেশ্য হলোঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকা যা দ্বারা সে কা'বা ঘর পর্যন্ত যাতায়াত করা ও সেখানে অবস্থানকালীন ব্যয়ভার বহন করা এবং বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকা। দৈহিকভাবে হাজ্জ পালনে সক্ষম হওয়া। মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা মাহরাম কোন সফরসঙ্গী থাকা। সফরসঙ্গী নিজ খরচে হাজ্জ করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। অনুরূপভাবে রাস্তা নিরাপদ হওয়া। এসব শর্ত পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর হাজ্জ ফারয হয়।

উমরা ও হাজ্জ পালনের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ঃ

শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জ এ তিন মাস হলো হজ্জের মাস। এ সময় হাজ্জ পালন করতে হয়।

হাজ্জ তিন প্রকার। তামাত্তু', কিরান ও ইফরাদ। উপমহাদেশের বা দূরের হাজ্জযাত্রীগণ সাধারণত তামাত্তু' হাজ্জ করে থাকেন, তাই প্রথমে তামাত্তু' হজ্জের নিয়ম উল্লেখ করা হলো।

তামাত্তু' হাজ্জ ঃ

হজ্জের মাসসমূহে পৃথক পৃথক ইহরামে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জের নির্ধারিত দিনসমূহে হাজ্জ পালন করাকে তামাত্তু' হাজ্জ বলা হয়।

উমরা পালনের নিয়ম ঃ

ইহরাম বাঁধা, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করা, মাথা মুণ্ডন করা এই চারটি কাজের মাধ্যমে উমরা সম্পন্ন হয়। এ পর্যায়ে এ চারটি কাজের বিবরণ সংক্ষেপে পেশ করা হলো–

এক. ইহরাম বাঁধা ঃ নখ কাটা, ক্ষৌরকর্ম করা, উযু ও গোসল করা, সম্ভব না হলে শুধু উযু করা, শরীরে মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধি লাগানো, বিমানে উঠার আগে সুবিধামত জায়গায় ইহরামের কাপড় পরা, ফারয নামাযের সময় হলে নামায আদায় করা, না হলে দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল উযু আদায় করে, বিমানে আরোহণ করা, মীকাতে পৌঁছার পূর্বে ইহরামের ঘোষণা দেয়ার পর মনে মনে উমরার নিয়ত করা এবং মুখে **لَبَّيْكَ عُمْرَةً** (লাব্বাইকা উমরাতান) বলা, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করা–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لكَ.

এরপর থেকে হাজ্জ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি করে তালবিয়া পাঠ ও যিকর আযকার করতে থাকা।

দুই. বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা ঃ পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা। প্রবেশ করার সময় নিচের দু'আটি পাঠ করা।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

এরপর মনে মনে তাওয়াফের নিয়ত বা সংকল্প করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, স্পর্শ অথবা ইশারা করে তাওয়াফ বা কা'বা প্রদক্ষিণ শুরু করা এবং হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে শেষ করা। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করলে এক তাওয়াফ হয়।

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ডান হাত ইশারা করা ও بِسْمِ اللهِ اللهُ اَكْبَرُ বলা।

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কা'বার অন্য কোন অংশ তাওয়াফের সময় স্পর্শ না করা।

হাতিমের বাইর দিয়ে তাওয়াফ করা।

বাইতুল্লাহর তাওয়াফে প্রথম তিন চক্করে রমলের (হালকা দৌড়ানোর) সময় ব্যতীত কাঁধ খালি রাখা ঠিক নয়। রমলের সময় চাদরের একাংশ ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে দিতে হবে। একে ইজতিবা বলা হয়।

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে নিচের দু'আটি পড়া।

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار.

খুশুখুযুর সাথে তাওয়াফ করা, সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করা। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক'আত নামায আদায় করা। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করা। এরপর যমযমের পানি পান করা।

তিন. সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করা ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে যাওয়া আসা করাকে সা'ঈ বলে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলে এক চক্কর হয়, আবার মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে আরেক চক্কর হয়। এভাবে সাত চক্কর দিলে এক সা'ঈ হয়। আর সা'ঈ বলতে এক সা'ঈ বুঝানো হয়।

চার. মুণ্ডন করা ঃ তাওয়াফ ও সা'ঈ করার পর মাথা মণ্ডন অথবা সমস্ত মাথার চুল সমানভাবে ছোট করা, গোসল করে সেলাই করা কাপড় পরিধান এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে হালাল হয়ে যাওয়া। এভাবে উমরা সম্পন্ন হয়ে যায়। উমরার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করতে হবে।

তামাত্তু' হাজ্জ পালনের আরো একটি নিয়ম আছে। তা হলো ঃ ইহরাম না বেঁধে নিজ এলাকা থেকে সরাসরি মদীনায় গমন করা। যিয়ারতে মদীনা শেষ করে মক্কায় আসার পথে আবয়ারে আলী নামক জায়গা থেকে উমরার নিয়াতে ইহরাম বাঁধা এবং মক্কায় এসে তাওয়াফ, সা'ঈ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাওয়া ও হজ্জের জন্য মক্কায় অবস্থান করা।

হাজ্জ সম্পাদনের নিয়ম ঃ

হাজ্জ সম্পাদন করতে উল্লেখযোগ্য এগারোটি বিধান পালন করতে হয়।

সেই বিধানগুলো হলো ঃ এক. ইহরাম বাঁধা, দুই. মিনায় গমন, তিন. আরাফার ময়দানে অবস্থান, চার. মুযদালিফায় রাত যাপন, পাঁচ. জামরাসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ, ছয়. কুরবানী করা, সাত. মাথা মুণ্ডন করা, আট. ফারয তাওয়াফ করা, নয়. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা, দশ. ১০ ও ১১ই জিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করা, এগার. বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এ পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকটি বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এক. ইহরাম বাঁধা ঃ তামাত্তু' হাজ্জ পালনকারীগণের জন্য এটা হবে দ্বিতীয় ইহরাম অর্থাৎ হজ্জের ইহরাম। এই ইহরামের জন্য কোথাও যেতে হবেনা। যে বাসায় বা যে হোটেলে আছেন সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে। ৮ই জিলহজ্জ ফজরের পর থেকে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। হজ্জের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম, উযু, গোসল, সম্ভব হলে শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি লাগানো। ইহরামের কাপড় পরিধান করা, নামাযের সময় হলে নামায আদায় করা, অন্যথায় দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল উযু আদায় করা, এরপর হজ্জের নিয়ত করে মুখে لبيك حجًّا (লাব্বাইক হাজ্জান) বলা, এরপর পুরো তালবিয়া পাঠ করা।

দুই. মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ঃ হজ্জের দ্বিতীয় কাজ হবে মিনার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা ত্যাগ করা ও মিনায় গমন। নিয়ম হলো ৮ তারিখ ফজরের পর মিনার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা ত্যাগ করা। কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের কারণে এসেন্সির লোকেরা ৭ তারিখ দিবাগত রাতেও নিয়ে যেতে পারে। ৮ তারিখ মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা আদায় করা ও রাত যাপন করা।

তিন. আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ঃ হজ্জের তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো উকূফে আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। ৯ই জিলহজ্জ মিনায় ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পর তালবিয়া পড়তে পড়তে রওয়ানা করতে হয়। তবে বর্তমানে হাজ্জযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফজরের পূর্বেই আরাফায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মনে রাখবেন, জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখকে يوم عرفة বা আরাফার দিন বলা হয়। আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন হলো আরাফার দিন। এই দিনই তিনি সবচাইতে বেশি সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এই দীনের প্রতি তিনি রাজি হয়ে গেছেন। হাদীসে আরাফার দিনকে হাজ্জ বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, **الحج عرفة** হাজ্জ হলো আরাফা। উকূফে আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হাজ্জের শ্রেষ্ঠতম আমল। আর আরাফার ময়দানের মূল আমল হলো দু'আ। অতএব, এই দিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করে অধিক পরিমাণে দু'আ-দুরূদ পাঠ করতে হবে এবং দু'হাত উঠিয়ে পূর্ণ ইখলাসের সাথে কাকুতি-মিনতি সহকারে নাজাতের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে। আরাফার ময়দানে হজ্জের ইমাম বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন, তাঁর সেই ভাষণ শুনতে হবে এবং তাঁর পিছনে যোহর, আসর একসাথে এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করতে হবে। এভাবে আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে।

চার. মুযদালিফায় রাত যাপন ঃ আরাফার ময়দানে মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার সময় এক

আযান ও দুই ইকামতে প্রথমে মাগরিবের ৩ রাক'আত ফারয আদায় করতে হবে। এরপর ইকামত দিয়ে ইশার নামায বিতরসহ আদায় করতে হবে। এরপর বিশ্রাম। মুযদালিফায় রাত যাপন করে আওয়াল ওয়াকতে ফজর আদায় অতঃপর দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করতে হবে। দু'আ সমাপনের পর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করতে হবে।

পাঁচ. কঙ্কর নিক্ষেপ ঃ ১০ই জিলহজ্জ হজ্জের বড় দিন। বছরের সর্বোত্তম দিন। এদিনকে ইয়াওমুন নাহার বলা হয়। মুযদালিফায় অবস্থানকালে ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এদিন মিনায় পৌঁছে প্রথম কাজ হবে বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। এর সুন্নাত হলো সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পূর্বে করা। তবে এর পরেও ১০ তারিখ দিবাগত রাত সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয হবে।

কঙ্কর নিক্ষেপের নিয়ম ঃ তালবিয়া পড়তে পড়তে জামরাতের দিকে অগ্রসর হতে হবে। মিনার দিক থেকে তৃতীয় এবং মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরা– জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরা। এ জামরায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি কঙ্কর "আল্লাহু আকবার" বলে খুশুখুযুর সাথে পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। আবেগে জুতা, সেণ্ডেল নিক্ষেপ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

ছয়. কুরবানী করা ঃ কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে এই দিনের দ্বিতীয় কাজ হবে কুরবানী করা। তামাত্তু' ও কিরান হাজ্জকারীগণের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব, ইফরাদ হাজ্জকারীর জন্য মুস্তাহাব। কুরবানী ব্যাংকের মাধ্যমে করা নিরাপদ। ব্যাংকের মাধ্যমে করতে না পারলে কাফেলার লিডারের মাধ্যমে করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আপনার কুরবানী করা হলো কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিজে না পারলেও কাফেলার কয়েকজন যুবক হাজীকে লিডারের সাথে রাখা যারা পশু ক্রয় ও কুরবানীর বিষয়টি স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হবেন। এটি ১০ই জিলহজ্জের দ্বিতীয় কাজ।

সাত. মাথা মুণ্ডন ঃ ১০ই জিলহজ্জের তৃতীয় কাজ মাথা মুণ্ডন করা। এটা করা উত্তম। তবে মুণ্ডন না করে চুল ছোট করলেও চলবে। সমস্ত মাথা সমান করে ছোট করতে হবে। মহিলাদের মুণ্ডন করতে হবে না। তারা মাথার সমস্ত চুল এক সাথে ধরে হাতের আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ কাটলে চলবে। মাথা মণ্ডনের পর নখ কাটা ও ক্ষৌরকর্ম করা সুন্নাত। এরপর গোসল করে সেলাই করা কাপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হওয়া।

আট. তাওয়াফে যিয়ারত ঃ ১০ই জিলহজ্জের চতুর্থ আমল হলো, তাওয়াফে যিয়ারত। এটি ফারয তাওয়াফ। এ তাওয়াফ বাদ পড়লে হাজ্জ সম্পন্ন হবে না। এর আওয়াল ওয়াক্ত শুরু হয় দশ তারিখ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর থেকে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে ১২ই জিলহজ্জের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় দম দেয়া ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফকীহর মতে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করে নেয়া উত্তম। এর পরেও করা যেতে পারে।

নয়. সাফা-মারওয়া সা'ঈ ঃ উমরা পালনের সময় যে নিয়মে সা'ঈ করা হয়েছে তাওয়াফে যিয়ারতের পর একই নিয়মে সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ করতে হবে। তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পন্ন করে মিনায় ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে রাত যাপন করতে হবে।

দশ. ১০ ও ১১ই জিলহজ্জ মিনায় অবস্থান ঃ ১০ই তারিখ তাওয়াফ ও সা'ঈ শেষে মিনায় গিয়ে রাত যাপন করতে হবে। ১০ই জিলহজ্জ কুরবানী, মাথা মুণ্ডন, তাওয়াফ ও সা'ঈ না করে থাকলে ১১ই জিলহজ্জ এ আমলগুলো করে নিতে হবে। এদিন সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে প্রথমে ছোট তার পর মেঝে। অতঃপর বড় জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে ঐদিনগত রাত সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে।

১২ই জিলহজ্জ ঃ কুরবানী, মাথা মুণ্ডন, তাওয়াফ ও সা'ঈ ইতোপূর্বে না করে থাকলে প্রথমে এ আমলগুলো করে নিতে হবে। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে পূর্ব দিনের ন্যায় ছোট, মেঝো ও বড় জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

১৩ই জিলহজ্জ ঃ ১০ ও ১১ তারিখ রাত মিনায় যাপন করতে হবে। ১২ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত হলে ১২ তারিখ রাতও মিনায় যাপন করতে হবে এবং ১৩ তারিখ পূর্বের ন্যায় ৩ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করতে হবে। ১৩ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করা উত্তম। অবশ্য ১২ তারিখও মিনা ত্যাগ করা যায়। তবে সেটা করতে হলে ১২ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই তা করতে হবে।

এগার. বিদায়ী তাওয়াফ ঃ কঙ্কর নিক্ষেপ পর্ব শেষ করে মক্কা মুকাররামায় ফিরে যেতে হবে। দেশে ফেরা অথবা মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়া পর্যন্ত মক্কায় মুকাররামায় অবস্থান করতে হয়। মাসজিদে হারামে পাঁচ ওয়াকত নামায, দু'আ দুরূদ ও যিকরে মশগুল থাকা। মক্কা মুকাররামা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে মক্কা মুকাররামা ত্যাগ করা।

উপরোক্ত মুবারক আমলসমূহের মাধ্যমে তামাত্তু' হাজ্জ সম্পাদিত হয়।

বাকি থাকলো কিরান ও ইফরাদ হজ্জের নিয়ম।

কিরান হাজ্জ ঃ

উমরার সাথে যুক্ত করে একই ইহরামে উমরা ও হাজ্জ আদায় করাকে কিরান হাজ্জ বলা হয়।

কিরান হাজ্জ আদায় করার নিয়ম ঃ

কিরান হাজ্জ দু'ভাবে আদায় করা যায়–

ক. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় হাজ্জ ও উমরা উভয়টার নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা। মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা পালন করা ও ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। হজ্জের সময় এলে একই ইহরামে মিনা ও আরাফায় গমন করা ও হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা।

খ. মীকাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধা। মক্কায় পৌঁছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু

করার পূর্বে হজ্জের নিয়ত উমরার সাথে যুক্ত করে নেয়া। উমরার তাওয়াফ ও সা'ঈ শেষ করে ইহরাম অবস্থায় হজ্জের অপেক্ষায় থাকা এবং ৮ই জিলহজ্জ একই ইহরামে মিনায় গমন ও হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

ইফরাদ হাজ্জ ঃ

উমরা না করে শুধু হাজ্জ করাকে ইফরাদ হাজ্জ বলে। মীকাত থেকে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হয়। মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম (বা আগমনি তাওয়াফ) করা। ইচ্ছা করলে সা'ঈও করা যেতে পারে। এ সময় সা'ঈ করলে হজ্জের ফারয তাওয়াফের পর তার আর সা'ঈ করতে হবে না। তাওয়াফে কুদুমের পর ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করতে হবে এবং ৮ই জিলহজ্জ একই ইহরামে হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ইফরাদ হাজ্জকারীর কুরবানী করতে হয় না বিধায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যেতে পারে। এরপর যিয়ারতে মদীনা।

মহিলাদের হাজ্জ সম্পর্কিত কিছু মাসয়ালা ঃ

- মহিলাগণ কেবল স্বামী অথবা কোন মাহরামের সাথেই হজ্জের সফর করবেন।
- ইহরামের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়লে গোসল করে ইহরাম বাঁধবেন।
- ঋতুবতী অবস্থায় তারা বাইতুল্লার তাওয়াফ ব্যতীত সা'ঈসহ হাজ্জ ও উমরার অন্যান্য সকল বিধান পালন করতে পারবেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ কাজটি সেরে নেবেন।
- ঋতুবতী হওয়ার কারণে কোন মহিলা বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে তাঁকে বিদায়ী তাওয়াফ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।
- মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড়-সালওয়ার কামিস, চাদর ইত্যাদি পরিধান করতে পারবেন।
- ইহরাম অবস্থায় তারা মুখ ঢাকতে পারবেন না। তাঁদের ইহরাম হলো তাদের মুখমণ্ডলে। অবশ্য মাথায় কিছু বেঁধে চেহারা থেকে একটু দূরে রেখে কোন কাপড় ঝুলিয়ে দিতে পারবেন যা চেহারা স্পর্শ করবে না।
- মহিলাগণ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বেন না। তারা পুরুষদের থেকে একটু দূরে থেকে তাওয়াফ করবেন।
- ঋতুবতী মহিলাগণ মাসিক বন্ধ হওয়ার পর পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে তাওয়াফে যিয়ারত বা ফারয তাওয়াফ আদায় করবেন। কিন্তু কোন মহিলার পক্ষে মাসিক বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই অপেক্ষা করা যদি সম্ভব না হয় এবং পরবর্তীতে এসে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে নেয়ারও কোন সুযোগ না থাকে তাহলে নিতান্ত ওজর বশত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ন্যাপকিন দিয়ে ভালো করে বেঁধে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নেয়া জায়েয হবে।
- মহিলাদের চুল সামান্য কাটলেই চলবে।

প্রশ্ন-২ : অমুসলিমদের যাকাত ও কুরবানীর গোস্ত দেয়া যাবে কিনা?

আব্দুর রহমান, ঢাকা

উত্তরঃ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

إِنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَملِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنْ اللهِ .

'যাকাত হলো কেবল ফকীর মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।' (সূরা তাওবা: ৬০)

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেন:

أخبر هم بان الله فرض عليهم (المسلمين) صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم –

তাদেরকে (ইয়ামেনবাসী মুসলিমদেরকে) তুমি জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলিমদের) প্রতি যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, তাদের বিত্তবানদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের অভাবীদের মাঝে তা বিতরণ করা হবে। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

যাকাত দেয়ার খাত আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর নির্ধারিত খাত ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। দিলেও তা আদায় হবে না।

অতএব, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা ছাড়া অন্য অমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয় বিধায় অমুসলিমদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। থাকলো কুরবানীর গোস্ত। এটা একটা সাদাকা বা সাধারণ দান। কাজেই প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী অমুসলিমদেরকে সৌজন্য হিসেবে তা দেয়া যেতে পারে। (ফতোয়া আল লাজনা আদ দায়িমা খ- ১০, পৃ ২৮-২৯)

প্রশ্ন-৩: মহিলাদের মাসিক অবস্থায় কুরআন তিলওয়াতের বিধান কি?

মোঃ রিদওয়ান হোসেন, বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা

উত্তর: মহিলাদের মাসিক অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা ও কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

لا يمسه الا المطهرون

"যারা পাক-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।" (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৭৯)

হাদীসে এসেছে,

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران

'ঋতুমতী নারী ও অপবিত্র (নাপাক) ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে না।' (তিরমিযী, ইবন মাজাহ, বায়হাকী)

অতএব, মাসিক চলাকালীন অবস্থায় মহিলারা পবিত্র কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করতে পারবে না। ■

ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা